পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারি

পুরস্কার ও গ্রন্থালয়ের জন্য অনুমোদিত

বুদ্ধের জীবন ও বাণী

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রীশরৎকুমার রায়

বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ

মূল্য এক টাকা মাত্র

১৩৩৩

প্রকাশক

শ্রীজোতিরিন্দ্রনাথ রায় বি, এ

২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিসিং হাউস,

২২।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ও

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড্,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
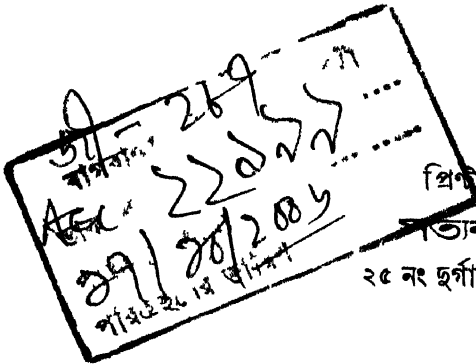
প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস,

সত্যনারায়ণ প্রেস,

২৫ নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

ঈড্যো বন্দ্যশ্চ। অথর্ব্ব ৫, ১২,৩

ইমা ব্রহ্ম ক্রিয়ত আবর্হিঃ সীদ। অথর্ব্ব ২০,২৩,২৩,

স চেতসো মে শৃণুতেদ মুক্তম্। অ ১,৩০,২

দদামি তদ্ যৎ তে অদত্তো অস্মি।

দেহিনু মে যন্ মে অদত্তো অসি।

সখা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ॥ অথর্ব্ব ৫,১১

হে অর্চ্চনীয়, হে বন্দনীয়, এই কয়টি ব্রহ্মবাণী রচিত হইয়াছে, তুমি এই আসনে উপবেশন কর। মনোযোগ করিয়া আমার এই উক্তি শ্রবণ কব। তোমাকে যাহা আমার দেওয়া হয় নাই, তাহা আজ আমি তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি। তুমিও যাহা আমাকে এখনও দাও নাই, তাহা আমাকে দাও। তুমি যে আমাদের সকলের সখা, আমাদের সকলের পরম বন্ধু।

(অথর্ব্ব সংহিতা)

যিনি সমগ্র জগতের কবি, এই আশ্রমের আচার্য্য এবং আমাদের অর্চ্চনীয় ও বন্দনায় সেই পূজ্যপাদ আচার্য্য **শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার রচিত এই সামান্য অঞ্জলি ভক্তিভরে নিবেদন করিতেছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রসন্ন আশীর্ব্বাদের দ্বারা আমাকে চরিতার্থ করুন।

শান্তিনিকেতন,
২৫এ বৈশাখ, ১৩২১

ভক্তি-প্রণত
শ্রীশরৎকুমাব রায়

নিবেদন

এই গ্রন্থে মহাপুরুষ বুদ্ধের সাধনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং স্থূল স্থূল উপদেশগুলি সঙ্কলিত হইল। এই রচনাকার্য্যে আমি বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় কয়েকখানি গ্রন্থ এবং রিসডেভিড্, পলকেরাস্, এড্মাগুহোম্স, ভিক্ষুশীলাকর, সুজুকি প্রভৃতি মহাত্মাদিগের রচনা হইতে সাহায্য পাইয়াছি। উল্লিখিত গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকটে আমি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আমার রচিত এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ক্ষিতিমোহন বাবু এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ কাব্যবিনোদ মহাশয় গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই সকল শুভার্থী বন্ধুদিগকে আজ গভীর কৃতজ্ঞতা জনাইতেছি।

যাঁহাদের উৎসাহে এই পুস্তক রচিত এবং মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চুণীলাল মুখোপাধ্যায় ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ কবিরঞ্জন মহাশয়দের নাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
৯ই বৈশাখ, ১৩২১

শ্রীশরৎকুমার রায়

ভূমিকা

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম্ এ
মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত)

মহাকবি কালিদাস তাঁহার মহাকাব্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের চরণে প্রণাম করিতে গিয়া এই চমৎকার কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, যাঁহারা শক্তিমান্ তাঁহারা বজ্রসূচীর ন্যায় শক্তিশালী। সকল মহাজীবনী রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল ও রত্নেরই ন্যায় কঠিন। সেই সব জীবনী মানুষ ব্যবহার করিত কেমন করিয়া যদি না মহাকবি তাঁহাদিগকে সর্ব্বমানবের গ্রহণযোগ্য করিতেন ? হীরকের সূচী যেমন রত্নের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহাকে সর্ব্বলোকলভ্য করিয়া দেয় তখন যে-কেহ সেই রত্নে সূত্র প্রবেশ করাইয়া কণ্ঠে ধারণ করিতে পারে, তেমনি যাঁহারা কবি ও শক্তিমান্ তাঁহারা এই জগতের রত্নবৎ ভাস্বর ও রত্নবৎ দৃঢ় মহাপুরুষ চরিত্রকে সকলের গ্রহণীয় করিয়া দেন। এমন দুঃসাধ্য কর্ম্মে কালিদাসও হাত দেন নাই, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিগণের কৃত রন্ধ্র আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাব্যমালা গাঁথিয়াছিলেন। বজ্রসূচীর কর্ম্ম নিজে করিতে সাহস পান নাই। অন্ততঃ এইরূপ একটা বিনয় গ্রন্থারম্ভে তিনি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অল্পশক্তি বলিয়াই সেইরূপ বিনয় বাদ দিয়া থাকি। আমার ন্যায় লোককেও যে এইরূপ একখানি ভক্তচরিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানিকে গ্রহণযোগ্য করিয়া দিতে হইবে তাহা কে জানিত ? অনেক অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতিতেও নিষ্কৃতি মিলিল না।

অনুরোধে, অনুরোধ অপেক্ষা আরও কঠিন প্রীতির শাসনে আমায় এই ভার লইতে হইল। কালিদাসের বোধ হয় কোন বন্ধু ছিলেন না, অন্ততঃ সেই সব বন্ধুদের কেহ গ্রন্থকার ছিলেন না এবং মুদ্রাযন্ত্রও তখন ছিল না, তাহা হইলে দেখিতাম কেমন করিয়া বিনয় রক্ষা পাইত? কালিদাসের কবিত্ব শক্তি বাদ দিয়াও সেই নিষ্কণ্টক যুগটির প্রতি অত্যন্ত লোভ উপস্থিত হয়।

গ্রন্থকার আমার বন্ধু; একই কর্ম্মে আমরা পরস্পরের সহযোগী। এমন অবস্থায় তিনি আমার শক্তিহীনতা দেখিয়াও দেখিলেন না কেন?—প্রেমে।

প্রেম একটি অপূর্ব্ব বজ্রসূচী, ইহার প্রসাদেই একজন আর একজনকে, মানব সকলকে লাভ করে। এই নানা লতাপাদপ-রম্য, নানা জীবজন্তুদেবমানববিচিত্র নিখিললোক আমার নিকট একটী নির্ব্বাসন ভূমি হইত যদি প্রেম না থাকিত; তবে সকলের মধ্যে আমি একা, গৃহের মধ্যে আমি বন্দী। প্রেমেই আমরা একজন আর একজনকে পাইয়া কৃতার্থ হই। মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় সকলের মহোৎসব লাগিয়া যায়।

এমন যে মহামূল্য প্রেম, তাহাকে ত বিনামূল্যে কিনিতে পারি না। এই প্রেমটি পাওয়া মাত্র সীমাসংখ্যার বোধখানি বিসর্জ্জন দিতে হয়। পুত্রের রূপ কতটা তার সন্ধান মার কাছে মিলিবে না; সেই নয়নে ঐ রূপের সীমা নাই; পুত্রের কি গুণ তাহা পিতা বলিতে পারেন না, প্রেমে তিনি সীমাকে যে ছাড়াইয়া বসিয়াছেন।

তবে কি প্রেমের ধর্ম্মই অসত্য? একথা সত্য নহে।

আমরা মনে করি প্রত্যেক বস্তুর চারিদিকে যে ক্ষুদ্রতার সীমা আছে তাহাই বুঝি একান্ত সত্য। কিন্তু এই কথাই কি পরম সত্য? প্রত্যেক বস্তুই ও প্রত্যেক মানবই যে আবার তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল সীমা অতিক্রম করিয়া মহাগৌরবে বিরাজমান. এই লীলাই ত সাধক দেখিতে চাহেন? সাধকের সাধনাপূত নয়নে অণু আর অণু নাই—"সমত্বং গিরি সর্ষপয়োঃ"—"সর্ষপ ও পর্ব্বত দুই-ই সমান"; এইখানেই দর্শক ও পূজক একান্ত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে কেবলমাত্র চাহিয়া দেখিতেছে সে ত বস্তুর চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্রসীমাগুলিকেই বড় করিয়া দেখিবে; কিন্তু যে হৃদয় দিয়া দেখিতেছে ও পূজা করিতেছে সে ত এই সীমার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বসিয়াছে।

এইখানেই ঐতিহাসিকে ও ভক্তে প্রভেদ। ঐতিহাসিকের কাছে কোন বিশেষ ব্যক্তির কোন বিশেষ স্থান বা কোন বিশেষ কাল তাহার আপনার চতুর্দ্দিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু ভক্তের নয়নে সেই সব সীমা কোথায় মিলাইয়া যায়! সকল জগৎ যেমন, ব্রজভূমিও তেমনি, কিন্তু বৈষ্ণবের নয়নে সেই ভূমির কি আর তুলনা আছে? সে যে দেখে না, সে পূজা করে। যখন মহাপ্রভু চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন তখনও দিনরাত্রি আজিকারই মত নিষ্পন্ন হইত; কিন্তু সেই পুণ্যযুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া ভক্ত বৈষ্ণব বাসুদেব ঘোষ জীবনকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—"জীবন বৃথা," নরোত্তম দাস বলিয়াছেন—"নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।"

বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় যে সব মহাপুরুষ জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা যে কেবলমাত্র এই জগৎকে পবিত্র করিয়া যান তাহা নহে, তাঁহারা আমাদের একটী সুগভীর উপকার করিয়া দিয়া যান। আমাদের অন্তর আত্মাকে প্রাণ দিয়া যান, আমাদের আত্মাকে খাদ্য দিয়া যান। এই পৃথিবীর মাটিতে যে রস আছে, আকাশে যে সার আছে তাহাতো আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। বৃক্ষগণ নিঃশব্দে বসিয়া বসিয়া তাহা গ্রহণ করে এবং আমরা বৃক্ষমণ্ডলীর উপার্জ্জিত ফল, মূল, পত্র, কাণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করি। আকাশে এবং মাটিতে যে সার পদার্থ আছে তাহা নির্জ্জীব (Inorganic), তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া সজীব (Organic) করে কে ?—ঐ পাদপ-মণ্ডলী। জীব ও জড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা ক্রমাগত জড়লোক হইতে সকল সার লইয়া জীব মাত্রের গ্রহণীয় করিয়া দিতেছে। বৈষ্ণবেরা ভক্তকে বৃক্ষের ন্যায় বলিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক রহস্যটুকু তবু তাঁহারা জানিতেন না।

জগতে এমন কত কত জ্ঞানগম্য সত্য আছে যাহাতে জীবন-সঞ্চার করা হয় নাই। তাহা আমরা জ্ঞানে জানি, কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করিতে পারি না। এই সব মহাপুরুষ সেই সব নির্জ্জীব সত্যকে সাধন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া দেন, তখন সকলেই সেই সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে। তৃণভোজনে অসমর্থ প্রাণীর জন্য গাভী তৃণ ভোজন করিয়া উধোভাণ্ডে দুগ্ধ সঞ্চার করে ; অন্নগ্রহণে অসমর্থ শিশুর জন্য মাতা স্তনে অমৃত

রস ভরিয়া তোলেন। তখন জীবকুল পরিতৃপ্ত হয় ও শিশুকুল বাঁচিয়া যায়।

পরমেশ্বর সর্ব্বলোক চরাচরের পিতা, জ্ঞানে এই কথা কে না জানে? কিন্তু মহাপুরুষ খৃষ্ট আসিয়া পুত্রত্বকে সাধন করিলেন আর অমনি জগদ্বাসী কত লোক ভগবানকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গেল। ভগবান্ ত্রিলোকের পতি সকলেই জানে, মহাপ্রভু চৈতন্য সেই প্রেমসম্বন্ধ সাধন করিয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণ সেই রস হাতের কাছে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

তাই বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা নির্জ্জীব সত্যগুলিকে ধরিয়া সাধনাদ্বারা জীবন্ত করিয়া দেন, তখন সত্য আমাদের জিজ্ঞাস্য মাত্র থাকে না, তাহা আমাদের অন্তরের খাদ্য এবং প্রাণের আশ্রয় হইয়া উঠে।

এই পন্থায় বিপদ্‌ও আছে। জগতে কোন্ মহামূল্য নিধি বিনামূল্যে মানুষ লাভ করিয়াছে? ইহারও মূল্য দিতে হয়, বড় বিষম মূল্য দিতে হয়। যত দিন জ্ঞান নির্জ্জীব থাকে তত দিন তাহা পচে না, কিন্তু যেই তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে, তখনি তাহা বস্তুর ন্যায় প্রাণহীন হইলেই পচিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মের এইরূপ বিকারে জগতে যত রক্তারক্তি ও মহাঅনর্থপাত ঘটিয়াছে তত কি নীচতম স্বার্থসাধন করিতে গিয়াও ঘটিয়াছে? কত হত্যা, কত দাহ, কত অত্যাচার, কত নিষ্ঠুরতা, কত কুসংস্কার, কত নির্য্যাতন! বড় কঠিন মূল্যে জীবন্ত সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু উপায় নাই, এই ভাবেই জীবন্ত সত্যগুলিকে মানব এ যাবৎ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বিপদ্ বাদ দিয়া সাধনাকে গ্রহণ করিবার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। যাঁহারা অতিশয় সাবধান হইতে গিয়াছেন তাঁহাদের সুচতুর নানা বন্ধনেই সত্যের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। সত্য জীবন্ত হইবে অথচ বিপদ্ থাকিবে না এমন উপায় আছে কোথায়? তাহার একমাত্র উপায় আছে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সর্ব্বাপেক্ষা উদার কিন্তু সেই জন্যই অতিশয় কঠিন। সেই উপায় সদা প্রাণবান থাকা। আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, মতে, সাধনায়, সেবায় কোথাও প্রাণহীন হইও না, তবে এই গলিত বিকারের প্রলয় হইতে রক্ষা পাইবে।

যাক্ সে কথা। মহাপুরুষেরা সত্যকে এই জীবন দেন বলিয়া সাধকমণ্ডলী যে তাঁহাদের কাছে যে কি উপকৃত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐতিহাসিক সেই সব মহাপুরুষকেও অন্যান্য মানুষের মত দেখেন কি না, তাই স্থান, কাল, ঘটনা ও নানাবিধ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়াই তাঁহাদিগকে দেখেন; কিন্তু সাধক মহাপুরুষকে বাহিরের ইন্দ্রিয়লোকে রাখেন না, তাঁহাকে একেবারে অন্তরলোকে লইয়া গিয়া "মনের মানুষ" করেন, তখন আর ত সীমার বা পরিমাণের বোধ থাকে না, তাই ভক্তদের হৃদয়ে মহাপুরুষগণ চিরদিনই সীমা অতিক্রম করিয়াই বিদ্যমান। খৃষ্ট ঐতিহাসিকের কাছে একজন মানুষ, পুণ্যবান্ সচ্চরিত্র হইলেও একজন মানুষ মাত্র, কিন্তু খৃষ্টীয়

সাধকের কাছে তিনি প্রেমলোকবিহারী মনের মানুষ অতএব আর তাঁহাকে স্থান-কাল-ঘটনার সীমার মধ্যে রক্ষা করা চলিল না।

কত মানব জগতে আছে কিন্তু আমার গৃহে যখন একটি মানবশিশু জন্মলাভ করে তখন ধূপ ধূনা-শঙ্খ ঘণ্টারবের মঙ্গলা-চাবে তাহাকে গৃহে গ্রহণ করি। জীর্ণচার দরিদ্র যে দিন বিবাহে চলে সেদিন তার রাজসজ্জা, বাজাও তাহার জন্য পথ ছাড়িয়া দেন, আজ যে সে প্রেমলোকে প্রবেশ করিবে, আজ সে বাজারও বড়। মহাপুরুষ আমার অন্তরের প্রেমলোকে আসিবেন কি প্রতিদিনেরই জীর্ণচীর পরিয়া? কণ্টকক্ষতচরণে, রৌদ্রদগ্ধবদনে, ক্ষুৎক্ষামদেহে? না, তিনি আসিবেন রাজার ন্যায় সমারোহে জয়বাদ্য বাজাইয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া।

যে মুহূর্ত্তে সাধকের অন্তরমধ্যে মহাপুরুষগণ প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা ঐতিহাসিক জন-সুলভ সব সীমাকে অতিক্রম করেন। তখন কোথাও সীমা নাই, শেষ নাই এবং কোনরূপ পরিমাণ নাই। সবই অনন্ত, সবই অসীম, সবই অশেষ। প্রেমের পরশমণির সিংহাসনের একেবারে উপরে যে তিনি আজ বসিয়াছেন। এই জন্যই বুদ্ধের দুই রূপ আছে, এক রূপ ঐতিহাসিকের নেত্রে, সেখানে তিনি রাজার পুত্র, কপিলবাস্তুতে তাঁহার জন্ম, নিরঞ্জনার তীরে তিনি সাধনা করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু আর এক রূপ আছে ভক্তের অন্তরে, সেখানে ভক্তের হৃদয়কমলে তাঁহার জন্ম, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য তাঁহার ভূষণ, সকল বিচিত্র ব্যাপারই তাঁহার লীলা ইত্যাদি।

এই পন্থার বিপদ্ বিস্তর। একটু প্রাণহীন হইলেই পচিয়া উঠিবার আর শেষ নাই। কিন্তু সাধনা অন্তরের বস্তু প্রেমের ধন। মহাপুরুষকে অন্তরলোকে না নিয়া সাধক যে পারেন না; উপায় যে নাই।

তাই ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদের কাছে আর একরূপ, সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন, একেবারে বুদ্ধেরই তপস্যা করেন। এই দুই রূপে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য করা কি কঠিন, সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া। সামঞ্জস্য হইলে যে বাঁচা যাইত।

এই গ্রন্থে সেই সামঞ্জস্যের জন্য গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে অথচ ভক্ত মহাপুরুষের জীবনীকে প্রাণহীন করাও হইবে না, বড় কঠিন ব্রত। মহাদেবের কুণ্ঠিত নৃত্যের চিত্র মনে পড়ে। আনন্দ তাঁহার অসীম অথচ সীমার জগতে তাঁহার নৃত্যলীলা করিতে হইবে। তাই সকল দিগ্বগুলের সীমায় সীমায় তাঁহার নৃত্যলীলা কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে। এই দুরূহ ব্রতে গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে পরিমাণ সাফল্য আশাও করি নাই তাহাও লাভ করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই দুই বিরুদ্ধ ধারাকে মিলিত করিয়া দীর্ঘ সময় চলা অসম্ভব, এই পথখানি যে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।" এইরূপ গ্রন্থ দীর্ঘ হইতেই পারে না, তাই এই গ্রন্থখানি খুব

গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব। অ-বৌদ্ধ সাধকের কাছে এইরূপ একখানি গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন ছিল; এই গ্রন্থে বুদ্ধের ঐতিহাসিক শুষ্ক মূর্ত্তিও নাই, আবার তিনি একেবারে দেবতা হইয়া অতি-প্রাকৃত হইয়া উঠেন নাই। এখানে তাঁহার সাধকবেশ। যে বেশে তিনি নিজে সাধনা করিয়াছেন সেই বেশেই সকল দেশের, সকল যুগের ও সকল সম্প্রদায়ের সাধকের হৃদয়ে অসাধারণ সেবা-রস ও অপূর্ব্ব সাধন-রস সঞ্চার করিতেছেন। তাই এই গ্রন্থে তিনি অতি প্রাকৃত নহেন। এই হরিহরের মিলনে যজ্ঞটি বড় মধুর হইয়াছে।

গ্রন্থকার গ্রন্থের সমস্ত বস্তুই বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে বা ভক্তদের লেখা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। শাস্ত্রে অবশ্য বুদ্ধবাণী ও বুদ্ধকাহিনী আছে কিন্তু ঐতিহাসিক বুদ্ধের ন্যায় শাস্ত্রের বুদ্ধবাণীও শুষ্ক। মহাপুরুষদের বহু বাক্য শাস্ত্র ঠিক বুঝিতে পারে না—তাহা তাঁহাদের সাধকেরাই বোঝেন, কারণ তাঁহারা তো জ্ঞান বা দর্শন বলিতে আসেন নাই যে শাস্ত্রে বা দর্শনে তাঁহাদের সব কথা ধরা পড়িবে। তাঁহাদের সাধনার গভীর বাণী বহু সময় শাস্ত্রে ধরা পড়েই না, এমন কি অনেক সময় তাঁহারা নিজেরাও তার সবটা ভাবিয়া দেখেন না। সাধক সাধনা করিয়া সেই সব তাৎপর্য্য বাহির করিয়া লয়েন।

মহাসাধকদের বাণী-ই মন্ত্র। মন্ত্র মাত্রেই বীজমন্ত্র। বীজের মধ্যে যে রূপটি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা কি শস্যের দোকানের পাষাণ-

ভিত্তিতে স্তূপীকৃত বীজের মধ্যে প্রকাশ পায়? ভক্তের সরস চিত্তউদ্যানে তাহার অন্তর-নিহিত শ্যামলতা, নানা পুষ্পবর্ণ-বিচিত্রতা, নানা ফলনিহিত মাধুর্য্য ধরা পড়িয়া যায়। তার স্পন্দন, কম্পন, ছায়া, রূপবসগন্ধ দেহমনপ্রাণকে জুড়াইয়া দেয়।

বুদ্ধ সাধক ছিলেন না, একথা যিনি বলেন তাঁহাকে বলিবাব মত আমার কিছু নাই। যে মহাসাধক তিনি ছিলেন—তাঁহার বাণী কি মন্ত্র না হইয়া যায়? তাহা না হইলে কি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানব তাঁহার বাণীতে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া যায়? শাস্ত্র দেখিয়া কি সেই বাণীর সব সার্থকতা বুঝা যায়? তাই গ্রন্থকার যত পারেন শাস্ত্র হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু মাঝে মাঝে সেই রত্নাবলীর তাৎপর্য্যের জন্য বুদ্ধের সব সাধকদের দুয়ারে হাত পাতিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে এমন একটি পংক্তি নাই যাহা হয় বৌদ্ধশাস্ত্র, না হয় কোন ভক্তজনের গ্রন্থ হইতে না লইয়াছেন। শাস্ত্রের এবং ভক্তের কাছে বাণী ও উপদেশ ভিক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক যাথাতথ্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া সাধক বুদ্ধের চরণে মন নত করিয়া যে অমৃত তিনি আজ আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়াছেন তার জন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি না।

এমন গ্রন্থের আরম্ভে প্রগল্‌ভতা সাজে না। ইতিপূর্ব্বেই যতখানি অপরাধ করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমি এখানেই নিবৃত্ত হইব।

জীবন

বুদ্ধের জীবন ও বাণী

প্রথম অধ্যায়

শাক্যবংশ ও শাক্যদেশ

কুশীনগর হইতে কুমায়ুনপর্য্যন্ত ভূভাগ এককালে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের নিবাসভূমি ছিল; এই প্রদেশের উত্তরে হিমগিরিশ্রেণী তরঙ্গাকারে বিরাজিত, পূর্ব্বে প্রতাপশালী মগধ ও লিচ্ছবিদের রাজ্য, এবং পশ্চিমে কোশল রাজ্য অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মগধরাজ নন্দ এক সময়ে ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; তাঁহার অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই ক্ষত্রিয়েরা হীনবীর্য্য হইয়াছিল; দেশের এই দুর্গতির দিনে শাক্যেরা দেশ-রক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলবাস্তু নগর রোহিণীনামক একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। চীন্ দেশের পরিব্রাজকেরা যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই এই নগর বিনষ্ট হইয়াছিল। সুপণ্ডিত কার্লাইল সাহেব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কপিলবাস্তুর অবস্থান

নির্ণয় করিয়াছেন। এই প্রাচীন নগরটি যেস্থানে বিদ্যমান ছিল, উক্তস্থান এখন ভুইলাগ্রাম নামে পরিচিত। গ্রামের সমীপে একটি হ্রদ আছে এবং অনতিদূরে একটি নদী প্রবাহিত। বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্তু বারাণসীধাম হইতে শতাধিক মাইল উত্তরে এবং অযোধ্যা হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

বুদ্ধচরিত-প্রণেতা অশ্বঘোষ বলেন যে, এই স্বভাবসুন্দর নগর এককালে কপিল ঋষির সাধনক্ষেত্র ছিল এবং সেইজন্যই নগরটি নাম কপিলবাস্তু হইয়াছে। অশ্বঘোষের অপর কাব্য সৌন্দরানন্দে কথিত আছে যে, সূর্য্যবংশীয় একব্যক্তি পিতৃশাপ-গ্রস্ত হইয়া কপিল মুনির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন; কালক্রমে তাঁহার বংশধরেরা এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ইহারা শাকবন-বেষ্টিত ঋষির আশ্রমে বাস করিতেন বলিয়া "শাক্য" আখ্যা পাইয়াছিলেন।

শাক্যবংশীয়েরা যে এককালে ভুজবলে ও সমৃদ্ধিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। ইহারা যে প্রদেশ অধিকার করিয়া বাস করিতেন, তাহার মধ্যে কপিলবাস্তু, শিলাবতী, সঙ্কর, দেবদহ প্রভৃতি অনেকগুলি সমৃদ্ধ নগরীর উৎপত্তি হইয়াছিল। হলচালন ও পশুপালনই যে রাজ্যের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা, সেখানে খুব পাশাপাশি বহু নগর গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সমৃদ্ধিশালী শাক্যরাজ্য যে বহুদূরব্যাপী ছিল, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পুণ্যবান্ শুদ্ধোদন এই সুবিস্তৃত রাজ্যের রাজা ছিলেন। সাধারণতঃ রাজা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তিনি তেমন সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভূপতি ছিলেন না। সগোত্রদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলিয়া, তিনি তাহাদের নায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজপদ তখন বংশগত ছিল না ; শাক্যেরা তাহাদের নির্ব্বাচিত নায়ককে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করিত।

রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের সহিত দেশের যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই যোগ ছিল। রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য কপিলবাস্তু নগরে "সন্থাগার" নামক একটি বিচারশালা ছিল ; তথায় সর্ব্বজন সমক্ষে রাজা বা নির্ব্বাচিত দেশনায়ক সাধারণ প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতেন। একমাত্র রাজধানীতে নহে, প্রধান প্রধান নগরেও "সন্থাগার" থাকিত। পল্লীবাসীরাও নিজেদের ছোট বড় প্রশ্নগুলি প্রকাশ্য সভায় মীমাংসা করিত। আম, কাঁটাল, গুবাক, নারিকেলের বাগানে খোলা জায়গায় পল্লীবাসীদের বৈঠক বসিত।

শাক্যেরা ক্ষত্রিয় হইলেও কৃষি ও পশুপালনই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। হিমালয়ের অদূরবর্ত্তী সমতল ভূভাগে শস্যক্ষেত্রের পাশে পাশে শাক্যদের ঘরগুলি অবস্থিত ছিল। কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীদের বাসের জন্য স্বতন্ত্র গ্রাম নির্দ্দিষ্ট থাকিত। সুবিস্তৃত বনভাগের দ্বারা গ্রামগুলি ব্যবহিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই সকল অরণ্যে দস্যুরা

বাস করিত ; কিন্তু তাহাদের উপদ্রবের কোনও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সময়কার গ্রামগুলিকে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বলা যাইতে পারে।

গ্রামবাসীরা সরল সুন্দর জীবন যাপন করিত। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র এইরূপ অর্থগত বৈষম্য তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত না। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অল্পায়াসে চলিয়া যাইত—চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না—আপনাদের পল্লীমধ্যে তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত। পল্লীবাসীদের মধ্যে যেমন কেহ প্রবল ভূস্বামী ছিল না, তেমনি নিরন্ন পথের ভিখারীও দেখা যাইত না।

পল্লীবাসীদের সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব ছিল না। তাহাদের দিনগুলি একরূপ অনায়াসেই শান্তিতে কাটিয়া যাইত। কেবল যে বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু শস্য নষ্ট হইয়া যাইত সেই বৎসর গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি শোনা যাইত। বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে এরূপ দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাওয়া যায়।

পল্লীবাসীদের বাসগৃহগুলি কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট ছিল। বিচ্ছিন্ন গৃহের উল্লেখ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। দুইখানি গৃহের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত রাস্তামাত্রের ব্যবধান থাকিত।

প্রত্যেক গৃহস্থই কতগুলি গো-মহিষাদি পশু রাখিত। এই সকল পশুর জন্য পল্লীবাসীদের সাধারণ একখানি চারণভূমি থাকিত। শস্যক্ষেত্রের ফসল যখন উঠিয়া যাইত, তখন পল্লী-

বাসীদের গৃহপালিত পশুগুলি ঐ ক্ষেত্রেই চরিয়া বেড়াইত ; কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল থাকিলে তাহাদের পক্ষ হইতে একব্যক্তি পশুগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য নির্ব্বাচিত হইত। সাধারণতঃ বিশ্বাসী ও সুযোগ্য ব্যক্তির উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইত। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পশুরক্ষক তাহার প্রতিপালিত পশুর আকৃতি, গাত্রের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বলিয়া দিতে পারিত। পশুদের গাত্র হইতে মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি তাড়াইয়া দিবার কৌশল, ক্ষত আরোগ্য করিবার চিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকিত।

কৃষিকার্য্য-পরিচালনারও মোটামুটি সুব্যবস্থা ছিল। নালী কাটিয়া ক্ষেত্রে জল প্রদানের ভার পল্লীসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিতে হইত। সম্প্রদায়ের নায়ক স্বয়ং ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রের চারিদিকে বেড়া দিতে পারিত না ; সমগ্র ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেওয়ার বিধান ছিল। ক্ষেত্রখণ্ডগুলিকে লইয়া সমগ্র ক্ষেত্রের যে আকৃতি হইত, উহা দেখিতে অনেকটা বৌদ্ধ ভিক্ষুর চীবরখণ্ড-তুল্য ; উল্লিখিত প্রকার জনপদেই সেকালের ভারতবাসীদের অধিকাংশ বাস করিত ; সমগ্র দেশের মধ্যে অতিঅল্পসংখ্যক লোকই নগরে থাকিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধের বাল্য ও গার্হস্থ্য জীবন

যাঁহার সাধনা পৃথিবীকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে এবং এককালে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-কলা ও স্থাপত্য, সকল বিভাগকে সজীব করিয়া দিয়াছিল, আমরা সেই মহাপুরুষ বুদ্ধের জাবন সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমাদের আলোচ্য ভগবান্ বুদ্ধ—ঐতিহাসিক মহাপুরুষ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অলৌকিকত্ব ও আতিশয্য বর্জ্জন করিয়া তাঁহার চরিত্রঅঙ্কনের চেষ্টা করিব।

ভগবান্ বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মহামায়া। অনুমান খৃঃ পূঃ ৬২৩অব্দে কপিলবাস্তুর অদূরবর্ত্তী লুম্বিনী নামক প্রমোদকাননে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার জন্ম হয়; কথিত আছে, উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে জননী মহামায়া যখন শালতরুর একটি পুষ্পিত পল্লব ছিন্ন করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্র প্রসূত হয়। কুমারের জন্মে রাজ্যে সকলেরই অর্থসিদ্ধি হইয়াছিল বলিয়া, শুদ্ধোদন তাঁহার

নাম "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" (বা "সিদ্ধার্থ") রাখিলেন। পুত্রপ্রসবের সপ্তম দিনে জননী মহামায়ার মৃত্যু ঘটে।

পুরবাসীদের কল্যাণকারিণী এবং নৃপতি শুদ্ধোদনের প্রাণতুল্যা মহামায়ার অকাল মৃত্যুতে সকলেই বিষণ্ণ হইলেন; শুদ্ধোদন নবকুমারের মুখ চাহিয়া কোনরূপে পত্নীশোক সংবরণ কবিলেন। শিশু সিদ্ধার্থ বিমাতা ও মাতৃষ্বসা গৌতমীর অঙ্কে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

ভোগ ও সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও সিদ্ধার্থ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর ও সংযত ছিলেন। বালসুলভ চাপল্য তাঁহার ছিল না; বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি সুপণ্ডিত হইলেন। ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবিদ্যাতেও তিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। শাক্যকুলে অশ্বারোহণ ও রথচালনে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না বলিয়া প্রকাশ। উত্তরকালে যে করুণার দ্বারা তিনি সকল মানব ও প্রাণীকে আপনার করিয়া ফেলিয়াছিলেন. বাল্যে ও কিশোরকালেই তিনি তাঁহার প্রথম আভাস প্রদান করেন। দলের সঙ্গে মিশিয়া তিনি শিকার করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কখনও কোন প্রাণীর প্রাণসংহার করিতেন না।

এই সময়কার একটি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা সিদ্ধার্থের জীবপ্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। কথিত আছে, একদা নির্ম্মল বসন্তপ্রভাতে তিনি রাজবাটীর উদ্যানে ভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, এমন সময়ে একঝাঁক কলহংস মধুর কলরবে আকাশ মুখরিত করিয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। সহসা তীরবিদ্ধ হইয়া একটী হংস সিদ্ধার্থের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। হংসটির শুভ্র বক্ষঃস্থল রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। সিদ্ধার্থ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া আহত হংসটিকে কোলে লইয়া তীরটি তুলিয়া ফেলিলেন এবং স্নেহশীতল হস্তে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। পক্ষীটি কেমন বেদনা পাইয়াছে পরীক্ষা করিবার জন্য সিদ্ধার্থ তীরের অগ্রভাগ নিজ হস্তে বিঁধাইয়া দিলেন এবং তদনন্তর সজলনয়নে আবার তাহার সেবায় রত হইলেন। তাঁহার করুণ শুশ্রূষায় পাখী বাঁচিয়া উঠিল।

ইহার মধ্যে সিদ্ধার্থের জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত উদ্যানে উপস্থিত হইল। তাহার অব্যর্থ সন্ধানেই হংস ভূতলশায়ী হইয়াছিল বলিয়া সে পাখীটি দাবী করিল। সিদ্ধার্থ বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি এই পাখীটি কিছুতেই তোমাকে দিতে পারি না, ইহার যদি মৃত্যু ঘটিত, তাহা হইলে তুমিই পাইতে, আমার সেবায় এই পাখীটি বাঁচিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ইহাতে এখন আমারই অধিকার।" এই পাখীর অধিকার লইয়া দুইজনের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ হইল। অবশেষে প্রবীণ ব্যক্তিদের সভায় ইহার বিচার হইল। তাঁহারা বলিলেন, "যিনি প্রাণরক্ষা করেন জীবিত প্রাণীর উপর তাঁহারই অধিকার, সুতরাং সিদ্ধার্থই এই

পাখী পাইবেন।" সিদ্ধার্থের যে করুণরাগিণীতে একদিন সমগ্র মানবের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইবে এই ঘটনায় কৈশোরেই তাহার পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হইল।

কপিলবাস্তু নগরে প্রতি বৎসর হলকর্ষণোৎসব হইত। এই দিন রাজা অমাত্য, পারিষদ ও পৌরজনসহ মহাসমারোহে হলচালনা করিতেন। একবার কিশোর সিদ্ধার্থ এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবমত্ত পুরবাসীদের কলকোলাহলের মধ্যে তিনি একটি জম্বুবৃক্ষের মূলে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গভীর দৃষ্টির সম্মুখে নিষ্ঠুরতার ও হিংসার বীভৎসভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন, উদরান্ন-সংগ্রহের জন্য প্রখর সূর্য্যকিরণে কৃষকগণ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কি কঠোর সংগ্রাম করিতেছে! ক্লিষ্ট বলীবর্দ্দদের সুকোমল অঙ্গে মুহুর্মুহুঃ কি নির্ম্মম আঘাত পড়িতেছে! ইহাদের পদতলে পড়িয়া কত অসংখ্য ছোট ছোট প্রাণী নিহত হইতেছে! এই সকল মৃতদেহ লইয়া পক্ষীদের মধ্যে কি ভীষণ কড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে!

সিদ্ধার্থের করুণ আঁখি ধীরে ধীরে নিমীলিত হইয়া আসিল। অসংখ্য নরনারী, জীবজন্তুর দুঃখ তাঁহার সুকুমার চিত্ত স্পর্শ করিল। জন্মমৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। জম্বুবৃক্ষতলে চিত্রার্পিতের ন্যায় তিনি ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন।
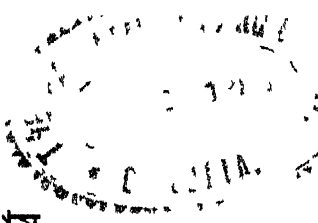
উৎসবান্তে গৃহে ফিরিবার সময়ে কুমারের খোঁজ পড়িল।

কিয়ৎকাল অনুসন্ধানের পরে পৌরজনেরা দেখিল তিনি নিস্পন্দ-দেহে নিমীলিতনেত্রে জম্বুতরুতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন। বিশ্বপ্লাবনী করুণায় উদ্ভাসিত কুমারের দিব্য মুখকান্তি দেখিয়া শুদ্ধোদনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বহুক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিলে পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি করুণকণ্ঠে কহিলেন—"পিতঃ, কৃষিকার্য্যে অসংখ্য জীবের প্রাণবিনাশ হয়, এই কার্য্য হইতে আপনি বিরত হউন।"

পুত্রের গাম্ভীর্য্য ও বৈরাগ্য বিষয়াসক্ত পিতাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। সিদ্ধার্থের মন ভোগসুখের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য পিতা তাঁহাকে বিবাহপাশে বন্ধন করিবার ইচ্ছা করিলেন। দণ্ডপাণি-দুহিতা গোপার সহিত কুমারের বিবাহ হইল। তাঁহার উদাসীন চিত্তকে ভোগাসক্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্য শুদ্ধোদন প্রত্যহ নৃত্যগীত আমোদ-প্রমোদের বিবিধ ব্যবস্থা করিলেন।

রূপবতী ও গুণবতী গোপাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিলেন। হিতৈষিণী সাধ্বী পত্নীর সাহচর্য্যে তাঁহার জীবন সুখময় হইল। গার্হস্থ্য-জীবনের সুখভোগে তাঁহার জীবনের কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল।

———

তৃতীয় অধ্যায়

—:*:—

বৈরাগ্যসঞ্চার

সমগ্র মানবজাতিকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিবার কল্যাণকর সুমহৎ ব্রত যাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখভোগ তাঁহাকে কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে? রাজ-অন্তঃপুবেব প্রচুর ভোগবিলাসের আড়ম্বরের মধ্যে অবস্থিত হইলেও সিদ্ধার্থ আপনাব চিত্তে কখন কখন বাহির হইতে করুণ আহ্বান শুনিতে পাইতেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু নিরন্তর সমস্ত প্রাণীর জীবন দুঃখময় করিয়া বাখিয়াছে; ইহাদের আক্রমণ হইতে কি উপায়ে জীবকুল নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, এই চিন্তা বিদ্যুৎ-স্ফুরণের ন্যায় সময়ে সময়ে তাঁহার মনে উদিত হইত। জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ক্ষীণভাবে তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইত। মনের এইরূপ অবস্থায় সিদ্ধার্থকে ভোগবিলাস শান্তিদান করিতে পারিত না। গভীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

একদা বসন্তকালে সিদ্ধার্থের নগরভ্রমণের বাসনা হইল। তিনি পিতার নিকটে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাজার আদেশে নগর, পত্রে পুষ্পে পতাকায় ও মঙ্গলকলসীতে

সুসজ্জিত হইল। সারথি ছন্দককে লইয়া রথারোহণে সিদ্ধার্থ ভ্রমণে চলিলেন। এই সময়ে তিনি প্রথমদিনে পলিতকেশ, শিথিলচর্ম্ম, কম্পিতপদ, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দ্বিতীয় দিনে শুষ্ক, শীর্ণ, বিবর্ণ, চলৎশক্তিহীন রোগী এবং তৃতীয়দিনে এক মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন।

চরিত-আখ্যায়কগণ ঐ তিনদিনের মনোহর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অপরিহার্য্য দুঃখ এই সময়ে সিদ্ধার্থকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু এই সকল অতিরঞ্জিত আখ্যান সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সিদ্ধার্থ ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সম্বন্ধে শিশুতুল্য অজ্ঞ ছিলেন একথা শ্রদ্ধেয় নহে। তীক্ষ্ণধী ও স্বভাববিরাগী সিদ্ধার্থকে তাঁহার পিতা ভোগসুখে আসক্ত করিবার জন্য এত দীর্ঘকাল জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুহীন প্রমোদলোকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে এই সময়ে এই তিনের রহস্য তাঁহার চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল, জীবকুলের অপরিহার্য্য অনন্ত দুঃখ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এতদিন কেবল মাঝে মাঝে যে তত্ত্ব তাঁহার মনে আসিত, এক্ষণে উহা চিরদিনের জন্য গভীরভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গৃহজীবনের সুখভোগ হইতে তাঁহার মন চিরদিনের জন্য ফিরিয়া

আসিল। আপনাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি জীবের দুঃখ-মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই মঙ্গল-ব্রত সাধনের নিমিত্ত তাঁহাকে কি করিতে হইবে, কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, এই মহতী চিন্তা তাঁহাকে আবিষ্ট করিল। যখন মনের এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা সেই সময়ে চতুর্থ দিনে নগরভ্রমণকালে প্রশান্তমূর্ত্তি গৈরিকধারী এক সন্ন্যাসী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধুর শান্ত সংযত নির্ব্বিকার ভাব সিদ্ধার্থকে মুগ্ধ করিল। তিনি স্থির করিলেন, মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার জন্য সংসারের ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রতই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন, মহাত্যাগ ভিন্ন মহাকল্যাণ লাভের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।

সিদ্ধার্থের মনে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। একদিকে বাহির হইতে ত্যাগের গভীর আহ্বান, অপরদিকে স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী বিমাতা ও পতিপ্রাণা গোপার মমতার বন্ধন। তাঁহার আহারে রুচি নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, নৃত্যগীতে আসক্তি নাই।

সিদ্ধার্থের মনে যখন এইরূপ চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছিল, এমন সময়ে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন গোপা একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। এই সংবাদশ্রবণে তিনি বিন্দুমাত্র আনন্দলাভ করিতে পারিলেন না, পরন্তু গৃহত্যাগের বাসনা তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়

—:০:—

গৃহত্যাগ ও দেশপর্য্যটন

গৃহত্যাগের অবিচলিত সংকল্পে মন দৃঢ় করিয়া সিদ্ধার্থ উৎসবপ্রমত্ত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। স্নেহকোমল-হৃদয় জনককে না জানাইয়া গৃহত্যাগ করিলে তাঁহার হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, মনে করিয়া সিদ্ধার্থ পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে নিবেদন করিলেন—"জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর আক্রমণে জীবের জীবন দুঃখময় হইয়া আছে, এই মহাদুঃখ হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব স্থির করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

এই কথা শুনিয়া শুদ্ধোদনের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। তিনি পুত্রকে তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে বলিলেন। সিদ্ধার্থ বলিলেন,—আপনি আমাকে চারিটি বর প্রদান করিলেই আমি গৃহে থাকিতে পারি —(১) জরা যেন আমার যৌবন নাশ না করে; (২) ব্যাধি যেন আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন না করে; (৩) মৃত্যু যেন আমার জীবন হরণ না করে; (৪) বিপত্তি যেন আমার সম্পৎকে অপহরণ না করে।

পুত্রের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া শুদ্ধোদন কহিলেন—"বৎস,

তোমার প্রার্থিত বিষয়গুলি পূরণ করা মানবের অসাধ্য। অসম্ভবের অনুসরণ করিয়া জীবনের সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিও না। সন্ন্যাস-গ্রহণ-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া গৃহেই বাস কর।"

যে মহাভাবের আবেশে সিদ্ধার্থ আবিষ্ট হইয়াছেন, সার্থকতার যে ভাবী আশায় তাঁহার হৃদয় বললাভ করিয়াছে, বিষয়ী শুদ্ধোদন তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন? সিদ্ধার্থ অবিচলিতভাবে সবিনয়ে বলিলেন, "পিতঃ, মৃত্যু আসিয়া একদিন আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবেই—সুতরাং আমার সাধনার পথে আপনি বাধা উপস্থিত করিবেন না। যে ঘরে আগুন লাগে সে ঘর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, সংসার ত্যাগ করা ভিন্ন আমার শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই।"

পিতার চরণে প্রণাম করিয়া সিদ্ধার্থ চলিয়া আসিলেন। হতাশ হৃদয়ে শুদ্ধোদন গৃহত্যাগে বাধা জন্মাইবার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।

জীবের প্রতি অপার করুণায় সিদ্ধার্থের হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই মহাদুঃখ-পূর্ণ হৃদয় লইয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সুন্দরী নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন। সাধ্বী গোপা স্বামীর এরূপ ভাব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়তম, আজ তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।"

সিদ্ধার্থ উত্তর করিলেন—"*প্রিয়ে, তোমাকে দেখিয়া আজ* আমি যে আনন্দলাভ করিতেছি, তাহাই আমাকে পীড়িত করিতেছে। আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছি এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু আমাদের আনন্দভোগের পথে চির বাধা হইয়া রহিয়াছে।"

সাধ্বী গোপা স্বামীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন। সিদ্ধার্থের মনে এক্ষণে আর দ্বিতীয় কোন চিন্তা নাই, কি করিয়া জীবকুল জরাব্যাধিমৃত্যুর দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভ করিবে তিনি অহোরাত্র তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এই মহাভাবের নেশায় তিনি এমনি মত্ত হইলেন যে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই মুক্তির পথ আবিষ্কার ব্যতীত তাঁহার সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিবার শুভমুহূর্ত্ত খুঁজিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রি, রাজপুরবাসীরা নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ বিনিদ্রভাবে তাঁহার সুপ্ত পত্নী গোপার কক্ষে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত স্থানে "বাণী" শুনিলেন—"সময় উপস্থিত।"

নিদ্রিত পত্নী ও সুখসুপ্ত নবজাত পুত্রের মুখের দিকে একবার স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সিদ্ধার্থ ধীরভাবে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। এই স্তব্ধ নিশীথে চন্দ্র, তারকা, অসীম আকাশ, সকলে যেন সমতানে তাঁহাকে সীমাহীন উন্মুক্ত

পথে বাহির হইবার নিমিত্ত আনন্দে আহ্বান করিতে লাগিল।

তিনি তাঁহার সারথি ছন্দককে জাগাইয়া কহিলেন—অবিলম্বে অশ্ব প্রস্তুত কর, সংসার ত্যাগ করিয়া আমাকে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, তুমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না।

সিদ্ধার্থকে ফিরাইবার জন্য বুদ্ধিমান্ সারথি নানা যুক্তি দেখাইলেন, নানা তর্ক উত্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহার কোন যুক্তি, কোন তর্ক টিকিল না। সেই গভীর নিশীথে অশ্বপৃষ্ঠে একমাত্র সারথিকে লইয়া তিনি রাজভবন ত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচে অপরিজ্ঞাত পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে সিদ্ধার্থের মনে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার রূপকবর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত আছে, গৃহত্যাগের দিন রাত্রিকালে কামলোকের অধিপতি "মার" শূন্যমার্গে থাকিয়া সিদ্ধার্থকে রাজৈশ্বর্য্যভোগসুখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। বাহির হইতে অনন্তজীবের অব্যক্ত আহ্বানে সিদ্ধার্থ যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়া পথে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন স্ত্রী-পুত্র জনক-জননীর স্নেহপাশ এবং আজন্ম অধ্যুষিত প্রাসাদের সুখস্মৃতি যে তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে টানিতেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মানস সংগ্রাম যতই কঠোর হউক, সিদ্ধার্থ কিছুতেই বিচলিত না হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্ষিপ্রবেগে চলিতে লাগিলেন এবং বহুযোজন

পথ অতিক্রম করিয়া অণোমা নদীর তীরে প্রভাতের শিশির-স্নাত স্নিগ্ধ অরুণালোক দেখিতে পাইলেন।

নদী অতিক্রম করিয়া সিদ্ধার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। নদীসৈকতে দাঁড়াইয়া তিনি আপনাকে নিরাভরণ করিয়া পরিচ্ছদ সারথির হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন—"তুমি আমার আভরণ ও অশ্ব লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।" ছন্দক কহিলেন, "প্রভু, আমাকেও সন্ন্যাসব্রত-গ্রহণের অনুমতি দান করিয়া আপনার সেবক হইবার আদেশ করুন।

সিদ্ধার্থ বলিলেন—"না ছন্দক, তোমাকে অবিলম্বে কপিল-বাস্তুনগরে ফিরিয়া গিয়া, জনক-জননী-আত্মীয়স্বজনদিগকে আমার সংবাদ জানাইতে হইবে।" ইহার পরে সিদ্ধার্থ তরবারির দ্বারা তাঁহার কেশজাল কাটিয়া ফেলিলেন এবং এক ব্যাধের ছিন্ন কাষায় বস্ত্রের সহিত আপনার বসন বদল করিয়া ভিখারী সাজিলেন। কুমারের এই দীনবেশ দেখিয়া ছন্দক রোদন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কপিলবাস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন।

ভগ্নহৃদয় শুদ্ধোদনের সাংসারিক সুখের আশা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। পতিপ্রাণা গোপা সর্ব্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন করিয়া যৌবনে যোগিনী হইয়া রহিলেন।

এদিকে সিদ্ধার্থ একাকী অপরিজ্ঞাত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কোথায় আছেন, কোথায় যাইবেন, তাহা তিনি জানেন না; তবে তাঁহার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে,

অনন্ত জীবের জন্য তিনি মুক্তির একটি উদার পথ আবিষ্কার করিবেন।

অণোমা নদীর তীর হইতে সিদ্ধার্থ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একে একে তিন জন ঋষির আশ্রমে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন। কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। এই নিমিত্ত দেশপ্রচলিত সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনায় তিনি নিযুক্ত হইলেন।

এক আশ্রমে তিনি দেখিলেন যে, তথাকার সাধুরা কেহ পক্ষীর ন্যায় শস্য কুড়াইয়া ভক্ষণ করেন, কেহ মৃগের ন্যায় ঘাস খাইয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন, কেব বা সর্পের ন্যায় বাতাহারে দিন যাপন করিতেছেন। সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, এই সাধুরা বিশ্বাস করেন যে, ইহলোকে এইরূপ কঠোর সাধনা করিলে জন্মান্তরে তাঁহারা স্বর্গে স্থান পাইবেন। স্বর্গে দুঃখের লেশমাত্র নাই—চিরসুখ, চির আনন্দ। ইহলোকে যিনি যত দুঃখ স্বীকার করিয়া সাধনা করিবেন, স্বর্গে তিনি তত বেশী আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।

সাধুদের মুখে এইরূপ উত্তর শুনিয়া সিদ্ধার্থের মনে স্বর্গসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল এবং তিনি সাধুদের সহিত যে আলোচনা করিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ——

সাধুরা যে স্বর্গে বিশ্বাস করেন সেখানে স্বর্গগত মানব নির্দ্দিষ্ট

কালের জন্য বাস করেন, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে আবার তাঁহাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং স্বর্গলাভ দ্বারা নিত্যানন্দকে লাভ করা যায়, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

পৃথিবীতে আমরা যে সুখ অল্পপরিমাণে, অল্পকালের জন্য ভোগ করি, স্বর্গে সেই সুখ অধিকমাত্রায় দীর্ঘকালের জন্য ভোগ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গে দৈহিক সম্ভোগসামগ্রীর কোন অভাব নাই—দেবতাদের প্রমোদভবনে উর্ব্বশী-মেনকা-রম্ভা প্রভৃতি যুবতীরা নৃত্য গীতে সকলের মনোরঞ্জন করেন। স্বর্গবাসীরা কেহই কামনাবর্জ্জিত নহেন, মর্ত্ত্যবাসীদের ন্যায় তাঁহাদেরও কাম-ক্রোধহিংসা-দ্বেষ আছে।

স্বর্গগত মানবদের ও দেবগণের দেহ আছে, অতএব দেহ সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ কামনা তাঁহাদের থাকিবেই। সুতরাং স্বর্গবাসীরা মর্ত্ত্যমানবের মতই সুখদুঃখ ভোগ করেন। মর্ত্ত্যবাসীদের জীবনের পরিসর অতি অল্প বলিয়া তাহারা অল্পকাল অস্থায়ী সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন—স্বর্গবাসীদিগকে এই সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত বহুকাল ভুগিতে হয়। স্বর্গে নিত্যসুখ, নিত্যশান্তি থাকিতে পারে না।

যে সাধনা কামনার অগ্নিশিখার নির্ব্বাণ করিয়া দেয় না, যাহা সাধককে সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে অবস্থিত নিত্য শান্তির লোকে উত্তীর্ণ করে না, তেমন সাধনা গ্রহণ করিলে কি লাভ হইতে পারে?

জীবের অনন্ত দুঃখ সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগী করিয়াছে—কামনাই এই দুঃখের মূলে রহিয়াছে। যে স্বর্গে বিলাসবাসনা, কাম্যবস্তু ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, সেই স্বর্গ তিনি কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন? তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, শাস্ত্রবর্ণিত স্বর্গ মানবমনের কল্পনামাত্র। তিনি যে নিত্য অমৃতের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন, কল্পিত স্বর্গলোক তাহা নহে।

সিদ্ধার্থ মগধের রাজধানী রাজগৃহের অভিমুখে চলিলেন। এইখানে প্রতাপশালী নরপতি বিম্বিসার রাজত্ব করিতেছিলেন। বিন্ধ্যগিরির পাঁচটি শাখা এই নগরটিকে পরিবেষ্টন করিয়া ইহাকে এক অপূর্ব্ব স্বাভাবিক শ্রীদান করিয়াছিল। এখানকার শৈল-মালার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক গুহা ছিল। রাজধানীর সমীপবর্ত্তী এই সকল নিভৃত ও রমণীয় গিরিগহ্বর অসংখ্য সাধুর সাধনভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। মহামতি সিদ্ধার্থ এখানকার একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামনার সুমহান্ ভাব সিদ্ধার্থের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। কি উপায়ে মানবের দুঃখ দূর করি-বেন, কি উপায়ে মুক্তিলোক আবিষ্কার করিবেন, নির্জ্জনে তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এইখানে সিদ্ধার্থ একক ও অসহায় হইলেন। ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে হইত—নিজের হাতে তাঁহাকে আপনার আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হইত। মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি আজন্মের বিলাস বিসর্জ্জন করিলেন।
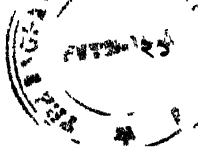
উদরান্নসংগ্রহের জন্য সিদ্ধার্থকে নগরে ভ্রমণ করিতে হইত। তাঁহার রমণীয় শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি নগরবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল—তাঁহার মুখকান্তি দেখিয়া সকলে ভক্তিতে বিহ্বল হইত। ভৃত্যদের মুখে এই অপূর্ব্ব তরুণ সাধুর খ্যাতি শুনিয়া মগধরাজ বিম্বিসার সিদ্ধার্থের সহিত দেখা করেন। তাঁহার পরিচয় পাইয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে কঠোর সন্ন্যাসব্রত ত্যাগ করিয়া সংসারধর্ম্ম-গ্রহণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য, সিদ্ধার্থের মন আর ভোগবিলাসের দিকে ফিরিল না।

সিদ্ধার্থ লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, বৈশালীতে আরাড়-কালাম নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ঋষি হিরণ্যবতী নদী তীরে বাস করেন। এই ঋষির তিন শত শিষ্য আছে। সিদ্ধার্থ ইহাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এখানে তিনি কিছুকাল শাস্ত্র চর্চ্চা করেন। অত্যুগ্র প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গুরুর জ্ঞাত সর্ববিদ্যা আয়ত্ত করিলেন কিন্তু যে মুক্তিলোকের সন্ধানে তিনি যৌবনে গৃহত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়াছেন, তাহার কোনো খোঁজই পাইলেন না।

অতঃপর এক শৈলগুহায় রামপুত্র রুদ্রকের সহিত তাঁহার দেখা হয়। এই সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি সাত শত শিষ্যকে শাস্ত্রাভ্যাস করাইতেন। শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সিদ্ধার্থ কিছুকাল ইহাঁর নিকটে শাস্ত্র পাঠ করেন। অল্পকাল-মধ্যেই তিনি গুরুর সমকক্ষতা লাভ করিলেন। রুদ্রক এই প্রতিভাশালী শিষ্যকে তাঁহার

আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের অধ্যাপকতা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইল না। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন যে, তাঁহার গুরু তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞান দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুক্তির যে উদার পন্থা আবিষ্কারের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা গুরুর অধিগম্য নহে। অগত্যা তিনি তাঁহার আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানের জন্য সিদ্ধার্থের ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচজন শিষ্য তাঁহার অনুগামী হইলেন। ইঁহাদের নাম কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, ভদ্রীয়, বাষ্প ও মহানাম।

দৈহিক সুখভোগের লালসা সাধনার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে; এই জন্য কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা দেহকে নিপীড়িত করিবার অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধার্থ মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া নিজের মনকে বাসনামুক্ত করিবেন, এবং তাহা হইলেই তিনি দুঃখের হাত এড়াইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। তিনি বুঝিলেন যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিয়া সত্যলোক লাভ করা যায় না, একমাত্র সাধনার দ্বারা ইহা লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে তিনি অনুকূল ক্ষেত্রের সন্ধানে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি গয়াশীর্ষ শৈলের সমীপে

উপস্থিত হইলেন। ইহার সন্নিকটে নৈরঞ্জনা ও মহানদী ফল্গুর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উরবিল্ব গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তথাকার নৈসর্গিক শোভা তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিল। স্বচ্ছসলিলা নৈরঞ্জনার পবিত্র তীরে সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

—:০:—

সাধনা ও বোধিলাভ

মহাপুরুষদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা মনুষ্যত্বকে মনোমোহন নব শ্রী দান করিয়া থাকেন। শর্করা যেমন জলের সহিত সর্ব্বতোভাবে গলিয়া মিশিয়া জলকে মধুর করে, মহাপুরুষেরাও তেমনি মানবজাতির সাধনাসমুদ্রে তাঁহাদের জীবনের সাধনার ধারা মিশাইয়া দিয়া মানবসাধনাকে নবীন গৌরব দান করেন। একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা মানব আপনার চরম সাফল্য নিজের চেষ্টাতেই অর্জ্জন করিতে পারেন; মানব আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্তা এবং আপনিই আপনার উদ্ধারকর্ত্তা; মুক্তিলাভের জন্য তাহার দ্বিতীয় কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নাই—মহাপুরুষ সিদ্ধার্থের সাধনা মানবত্বকে এই গৌরবমুকুট পরাইয়া দিয়াছে।

সমীপবর্ত্তী সেনানিগ্রামে এক ধনবান্ বণিকের পুণ্যবতী দুহিতা সুজাতা বহুসাধনার ফলে একটি পুত্রলাভ করিয়া সুবর্ণ পাত্রে পায়স লইয়া এইদিন বনদেবতার পূজা দিতে আসিলেন। তাঁহার একটী দাসী অগ্রে অগ্রে আসিতেছিল। তরুমূলে উপবিষ্ট ক্ষীণাঙ্গ সিদ্ধার্থের ধ্যানসুন্দর মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া সে বিস্মিত হইল এবং দৌড়িয়া গিয়া সুজাতাকে জানাইল যে, দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহার ভক্তিঅর্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য সশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হৃষ্টচিত্ত সুজাতা দ্রুতপদে তরুমূলে উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাবিকম্পিত করে দেবতার হস্তে পায়সান্নের পাত্র প্রদান করিলেন। "তোমার কামনা পূর্ণ হউক" বলিয়া সিদ্ধার্থ তাঁহার মহৎ দান গ্রহণ করিলেন সুস্বাদ পায়সান্ন ভোজন করিয়া তাঁহার দুর্ব্বল দেহে বলের সঞ্চার হইল। তিনি মধুরকণ্ঠে সুজাতাকে কহিলেন—"ভদ্রে, আমি দেবতা নই, তোমারই মত মানুষ, তোমার মঙ্গল হস্তের মহৎদান আজ আমার প্রাণরক্ষা করিল, মনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিল। আমি যে সত্যের সন্ধানে রাজ্যসুখ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি, তোমার এই অন্ন সত্যলাভের সহায় হইল। আমার মনে আজ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আমি সেই সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। তোমার কল্যাণ হউক।"

এই ঘটনার পরে সিদ্ধার্থ নিয়মিত পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার এই পরিবর্ত্তন পঞ্চ শিষ্যের মনে গভীর সন্দেহের সঞ্চা

অবলম্বন করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। ভাবনার পর ভাবনার তরঙ্গ উঠিয়া সিদ্ধার্থের সংশয়াকুল চিত্ত দোলাইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি একদিন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন—"দেবরাজ ইন্দ্র একটি ত্রিতন্ত্রী হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন; উহার একটি তার অতি দৃঢরূপে বাঁধা ছিল। তাহাতে আঘাত করিবামাত্র শ্রুতিকটু বিকৃত সুর বাহির হইল; অন্য একটি তার নিতান্ত শিথিল ছিল, উহা হইতে কোন সুরই নির্গত হইল না। মধ্যবর্ত্তী তারটি না শিথিল না-দৃঢ এমনই ভাবে যথাযথরূপে বাঁধা ছিল; সেই তারটিতে ঘা পড়িবামাত্র মধুর সুরে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নিদ্রাভঙ্গে সিদ্ধার্থের হৃদয় সত্যের বিমল জ্যোতির আবির্ভাবে পূর্ণ হইল। সাধনার উদার মধ্য পন্থা তাঁহার মনশ্চক্ষুতে প্রত্যক্ষ হইল। ভোগবিলাস ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যবর্ত্তী সত্যমার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি বোধিলাভের জন্য স্থিরসংকল্প হইলেন।

নিষ্ফল কঠোর সাধনায় স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধার্থ চিন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছেন, বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ মন বোধিলাভের পক্ষে অনুকূল। দেহকে সবল করিয়া মনকে জাগ্রত করিয়া তিনি নবীন সাধনায় পুনর্বার প্রবৃত্ত হইবেন, স্থির করিলেন। এই সংকল্পে উপস্থিত হইয়া তিনি একদিন শেষ রজনীতে সুস্নাত শুচি হইয়া একটি সুপরিষ্কৃত তরুমূলে ধ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন।

চিরবাঞ্ছিত বোধিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্তের ব্যাকুলতা কিছুতেই দূর হইল না। তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা বাসনাব অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে না, এবং ইহাদ্বারা সত্যেব বিমল আলোক লাভেব আশাও দুরাশামাত্র। একদা একটি জম্বুতরুতলে উপবিষ্ট হইয়া সিদ্ধার্থ তাঁহার মনের অবস্থা এবং কৃচ্ছ্রসাধনার ফলাফল বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—"আমাব দেহ ক্ষীণ, ক্ষীণতর হইয়াছে ; উপবাস দ্বাবা আমি কঙ্কালে পরিণত হইলাম, কিন্তু তথাপি নির্ব্বাণলোকের ত কোন সংবাদ পাইলাম না। আমাব অবলম্বিত এই কৃচ্ছ্রসাধনার পন্থা কিছুতেই আর্য্য মার্গ হইতে পাবে না। অতএব এক্ষণে উপযুক্ত পানাহার দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ কবিয়া মনকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত কবা কর্ত্তব্য।

এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি নৈরঞ্জনার নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিবা স্নান কবিলেন, তাঁহার শবীর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে স্নানান্তে চেষ্টা করিয়াও নিজের শক্তিতে তীবে উঠিতে পারিতেছেন না। অবশেষে নদীবক্ষে অবনত একটি বৃক্ষশাখা ধরিয়া তিনি কূলে উঠিলেন।

সিদ্ধার্থ আপন কুটীরের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে বনপথে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। পঞ্চ শিষ্য মনে করিলেন, সিদ্ধার্থের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতি সিদ্ধার্থ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি কোন্ সাধনাপ্রণালী

সিদ্ধার্থ যে সাধনায় বিজয়ী হইয়া মানবত্বের শিরে এই গৌরবমুকুট পরাইয়াছেন, সেই সাধনপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে তাঁহাকে বহু সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, গুরুদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, আপনিই আপনার অবলম্বন হইলেন। মন হইতে বাসনার শর তুলিয়া ফেলিবাব জন্য অনলস হইয়া কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সাধু চেষ্টা ও চিত্তের দৃঢ়তা দেখিয়া পঞ্চশিষ্য বিস্মিত হইলেন। কঠোর যোগী বলিয়া সিদ্ধার্থের খ্যাতি দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি দেহের দিকে কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য মনন ও ধ্যান করিতে লাগিলেন। জন্মমৃত্যুর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণলাভের জন্য তিনি কঠোর যোগ দ্বারা দেহ ও মনকে সংযত করিতে লাগিলেন। আহারের মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে একটিমাত্র তণ্ডুলকণায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একদিন নয়, দুই দিন নয়, এক মাস নয়, দুই মাস নয়, সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল এইপ্রকার কঠোর সাধনা চলিতেছিল। কত রৌদ্র, কত বৃষ্টি, কত শীত, কত গ্রীষ্ম, তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সিদ্ধার্থ তাহা জানিতেও পারেন নাই। তাঁহার দেহের দিব্যকান্তি বিলুপ্ত হইল, দৃঢ়-বলিষ্ঠ বিশালবপু কঙ্কালে পরিণত হইল।

কিন্তু এত ক্লেশ, এত যাতনা স্বীকার করিয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার

করিল। তাঁহারা ভাবিলেন, সিদ্ধার্থ তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া সাধনার সত্য পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। এতদিন তাঁহারা যাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছেন, এখন তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। বিমুখ শিষ্যদের এই শ্রদ্ধাহীনতা সিদ্ধার্থকে পীড়িত করিল, অন্তরের সেই বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি প্রশান্ত চিত্তে একাকী মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নৈরাশ্যের মেঘ কাটিয়া যাওয়ায় সিদ্ধার্থের চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ের আনন্দে বিশ্বপ্রকৃতি প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি যখন মৃদুলগমনে বোধিদ্রুমের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহারই আনন্দপুলকে পদতলে ধরিত্রী যেন শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। আপনার মহাসাধনার সফলতাসম্বন্ধে সন্দেহের শেষ রেখাটুকুপর্য্যন্ত যখন নিঃশেষে দূর হইল, তখন সিদ্ধার্থ অন্তর ও বাহির হইতে ক্রমাগত আশার বাণী শুনিতে লাগিলেন। অন্তর ও বাহির তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যেন ইহাই বলিতেছিল,—"হে সাধক, হে বরেণ্য, সিদ্ধিলাভের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগতপ্রায়, তুমি মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কল্যাণের আকর নির্ব্বাণ আবিষ্কার কর।

স্নিগ্ধ শ্যামল সন্ধ্যাকালে সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে নবীন তৃণ বিছাইয়া সমাসীন হইলেন। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি সঙ্কল্প করিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যায় যাক্, ত্বক্, অস্থি, মাংস ধ্বংস প্রাপ্ত হয় হউক, তথাপি বহুকল্পদুর্লভ বোধি লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবে না।

পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ সঙ্কল্পের বর্ম্মে আবৃত হইয়া সাধনসমরে প্রবৃত্ত হইলেন। শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইবার জন্য তিনি আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের প্রসুপ্ত পাপলালসাগুলি উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখা যেমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সিদ্ধার্থের পাপলালসাগুলি চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে অল্প সময়ের জন্য তেমনি আর একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহী পাপসমূহের সহিত তাঁহার অন্তরে যে তুমুল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, বিবিধ কাব্যে ও ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার চমৎকার রূপক বর্ণনা রহিয়াছে। পাপবাহিনীর সহিত সিদ্ধার্থের সেই সংগ্রামের বর্ণনা পাঠ করিলে মৃতকল্প ব্যক্তির হৃদয়েও অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হয়। নানা প্রলোভন দেখাইয়া কামলোকের অধিপতি মার সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি সুদৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন :—

মেরু পর্ব্বতরাজ স্থানতু চলেৎ সর্ব্বং জগন্নোভবৎ
সর্ব্বে তারকসঙ্ঘ ভূমি প্রপেতৎ সজোতিষেন্দ্রা নভাৎ।
সর্ব্বে সত্ব করেয় একমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো
নত্বেব দ্রুমরাজমূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ ॥

যদি পর্ব্বতরাজ মেরু স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশিয়া যায়, সমস্ত নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক ও ইন্দ্রের সহিত আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব এ মত হয এবং মহাসাগর শুকাইয়া যায়, তথাপি আমাকে দ্রুমমূল হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত কবিতে পারিবে না।

একে একে নানা পাপ প্রলোভন সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাঁহার অবিচলিত চিত্তের অমিত বিক্রম তাহাদের সকল চাতুরী ব্যর্থ করিযা দিল। অবশেষে স্বয়ং মার নানা আয়ুধে সজ্জিত হইয়া সম্মুখসংগ্রামে অগ্রসর হইল। পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "তুমি একাকী কেন :—

সর্ব্বেয়ং ত্রিসাহস্র মেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথ মেরু পর্ব্বতবরঃ পাণীষু খড়্গো ভবেৎ।
তে মহ্যং ন সমর্থ লোম চালিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্ম্মিতেন দৃঢ়ং ॥

এই তিন সহস্র মেদিনী যদি মারদ্বারা প্রপূর্ণ হয়, প্রত্যেক মারের হস্তের খড়্গ যদি পর্ব্বতবর মেরুর ন্যায় প্রকাণ্ড হয়,

তথাপি বিগ্রহে দৃঢ়বর্ম্মিত আমাকে পবাস্ত করা দূরে থাকুক, একবিন্দু টলাইতেও পারিবে না।

মার পলায়ন কবিল। সকল বাসনা সকল সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে পবিপূর্ণ হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি এখন "বুদ্ধ" হইলেন। তাঁহার মনশ্চক্ষুব সম্মুখে জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ প্রকাশিত হইল। তিনি ভাবিলেন—"মানব যখন জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা অমঙ্গল কর্ম্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ করে, তখনই সে বাসনাব আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ভোগলালসা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাসনাবিলোপের পূবেব মৃত্যু ঘটিলেও মানব শান্তি লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কামনা থাকিয়া যায় এবং তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

ভগবান্ বুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন "ধর্ম্মই সত্য, ধর্ম্মই পবিত্র বিধি, ধর্ম্মেই জগৎ বিধৃত হইয়া আছে এবং একমাত্র ধর্ম্মেই মানব ভ্রান্তি, পাপ এবং দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।"

তাঁহার প্রজ্ঞানেত্রের সম্মুখে জন্ম মৃত্যুর সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি বুঝিলেন, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধের উপায় এই চারিটি আর্য্য সত্য—অর্থাৎ (১) জন্মে দুঃখ, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুতে দুঃখ, অপ্রিয়ের সহিত মিলনে দুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ; (২) তৃষ্ণা হইতেই দুঃখের
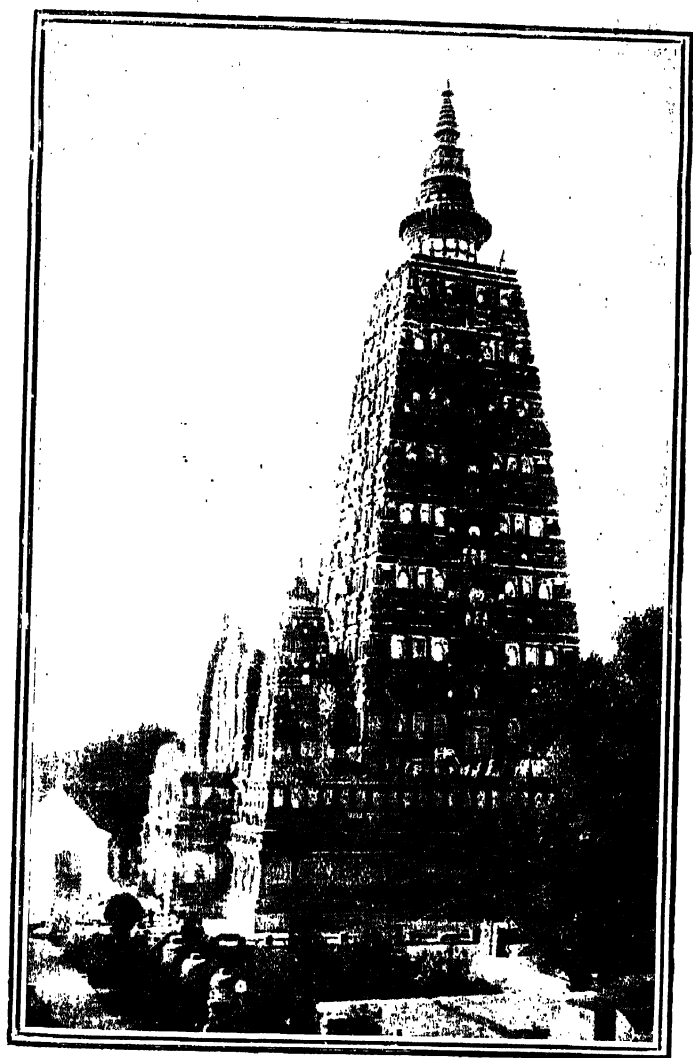
বুদ্ধগয়ার মন্দির

উৎপত্তি হইয়া থাকে ; (৩) তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিরোধ ঘটে ; (৪) এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় আটটি, যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—ঃ*ঃ—

বুদ্ধ ও তাঁহার পঞ্চ শিষ্য

মুক্তির বিমল আনন্দে সাধক বুদ্ধের অন্তর পূর্ণ হইল। যে বনস্পতিমূলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তথায় একাকী তিনি সাত সপ্তাহ তাঁহার নবলব্ধ অমৃত-উৎসের রসধারা নীরবে সম্ভোগ করিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ এখন বিশ্বব্যাপী আনন্দ ও অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছেন। সকল সংস্কার ও সকল বাসনার বিলোপ দ্বারা তিনি নির্ম্মল আনন্দ ও শাশ্বত জীবনলাভ করিয়াছেন।

নির্ব্বাণের এই মঙ্গলবাণী তিনি কেমন করিয়া সকলের বোধগম্য করিবেন, ইহাই এখন তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। যাঁহার মন হইতে অহংবুদ্ধি নিঃশেষে দূরীভূত হয় নাই, তিনি কোন-

মতেই পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারেন না ; এই বুদ্ধিই সমস্ত পাপ, সমস্ত অকল্যাণ, সমস্ত ভ্রান্তির উৎস। এক খণ্ড মেঘ যেমন বৃহৎ সূর্য্যকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া দেয় অহং বুদ্ধি তেমনি বিশ্বব্যাপী আনন্দকে অদৃশ্য ও অবোধ্য করিয়া রাখে।

বুদ্ধ ভাবিলেন—"আমি যে মহাসত্য লাভ কবিযাছি, যদি তাহা সাধাবণের মধ্যে প্রচাব না করি, তাহা হইলে ইহা দ্বাবা জীবের কি লাভ হইল ? দুঃখেব ফাঁদে পড়িয়া যাহাবা জন্মজন্মান্তর কঠোর সংগ্রাম কবিতেছে এবং তৎসঙ্গে অশেষ যাতনা ভোগ কবিতেছে আমাব তাহাদিগকে নির্ব্বাণের বাণী শুনাইতে হইবে। সর্ব্ব দুঃখ-নিবর্বাপক এই বাণী একবাব তাহাদেব চিত্ত স্পর্শ করিলেই, তাহাবা পরম শান্তি লাভ কবিতে পাবিবে।"

বুদ্ধের চিত্তে সময়ের জন্য সংশয় উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, যাহারা তৃষ্ণায় অভিভূত, তাহারা আমার এই জ্ঞানগম্য গভীর ধর্ম্ম বুঝিবে না। তাহাদের চঞ্চলবুদ্ধি জগতের কার্য্য কারণের নিয়ম, সংস্কার ও উপাধিব নিরোধ, সংযম এবং নিব্বাণ ধারণা করিতে পারিবে না। সুতরাং এই ধর্ম্ম প্রচার করিলে আমাব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। একদিকে এই সংশয় অপরদিকে জীবের প্রতি অপ্রমেয় করুণা, দুইদিক্ হইতে বুদ্ধের চিত্তকে আঘাত করিতে লাগিল। আপনার মনের মধ্যে আপনি তর্কবিতর্ক করিয়া অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সত্যানুরাগী শ্রদ্ধাশীলদের নিকটে আমার এই মুক্তির বাণী

প্রথমে প্রচার করিতে হইবে; তাহার পরে সত্য ধীরে ধীরে আপনাকে আপনি প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু কে সেই শক্তিশালী ব্যক্তি যিনি সর্ব্বপ্রথমে এই নব ধর্ম্মের পতাকা বহন করিবেন?

প্রথমে আড়ারকালাম ও রাজপুত্র রুদ্রকের কথা বুদ্ধের মনে পড়িল। কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা আর জীবিত নাই। ইহার পর পঞ্চ শিষ্যের স্মৃতি তাঁহার মনে উদিত হইল। এই শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বাসী পঞ্চ শিষ্য একদিন গভীর ধর্ম্মক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে বুদ্ধের অন্তরের অন্তরতম গোপন ভাণ্ডার অমৃতান্নে পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; কিন্তু তখন তাঁহাদিগকে ক্ষুধার অন্নদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন তাঁহার ভাণ্ডারে যে অমৃত সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দ্বারা পঞ্চ শিষ্য কেন, সমগ্র নরনারী তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন। যাঁহারা একদিন বিমুখ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি আব কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের সন্ধানে মৃগদাব বা ঋষিপত্তনের অভিমুখে ছুটিলেন।

বুদ্ধের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই শিষ্যদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই যে, সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতীতি হইল, তিনি তপোভ্রষ্ট হইয়া আসিতেছেন। মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন সিদ্ধার্থকে তাঁহারা কদাচ গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইবেন না;

কার্য্যতঃ কিন্তু উল্টা ব্যাপার দাঁড়াইল। সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের প্রসন্নমুখের দিব্য জ্যোতিঃ দেখিবামাত্র তাঁহাদের সকল সংশয় দূর হইল এবং মন শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা কবিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ কহিলেন—"প্রিয় শিষ্যগণ, কৃচ্ছ্রসাধনা ও ভোগ-বিলাসের আতিশয্য এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী কল্যাণময় মুক্তিবর্ত্ম আমি আবিষ্কাব করিয়াছি। সেই নির্ব্বাণ লাভ কবিবার উপায় আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিব।" তাঁহার তেজোময়ী বাণী শ্রবণ কবিয়া শিষ্যদেব মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ হইল। তাঁহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার পাঁচ-জন শিষ্যকে লইয়া ঋষিপত্তনের অদূববর্ত্তী এক হ্রদের তীবে গমন করিলেন। হ্রদের একপার্শ্বে উচ্চ ঢিবি রহিয়াছে। ঐ ঢিবির নিম্নদেশ হইতে সোপান বাহিয়া জলাশয়ে নামিতে হয। দীক্ষার্থী শিষ্যেরা জলান্তে উপস্থিত হইলে বুদ্ধ কহিলেন—'বৎসগণ, তোমাদের আজিকার স্নান প্রতিদিনের স্নানেব ন্যায় একান্ত সামান্য নহে, আজ তোমাদেব কেবলমাত্র দেহের মলিনতা ধুইয়া ফেলিলে চলিবে না, আজ তোমাদেব দেহের ও মনের সর্ব্বপ্রকার মলিনতা ধুইয়া-মুছিয়া অন্তরে বাহিরে পবিত্র হইতে হইবে।'

স্নান শেষ করিয়া শিষ্যেরা তীরে আসিলেন। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা

করিলেন—"বৎসগণ, তোমাদের অন্তর ও বাহির পবিত্র হইল কি ?" শিষ্যেরা উত্তর করিলেন,—"হাঁ" ! তখন তিনি মধুরকণ্ঠে গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন—"বৎসগণ, সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর শিষ্য দেখা যায়। এক শ্রেণীর শিষ্যদিগকে অধোমুখ কুম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। অধোমুখ কুম্ভ জলে নিমগ্ন হইয়াও ভরিয়া উঠে না, ইহাদের মনও তেমনি গুরুর উপদেশের প্রতি বিমুখ বলিয়া কস্মিন্ কালেও তাঁহার উপদেশামৃতে পূর্ণ হইয়া উঠে না। ইহারা যুগের পর যুগ গুরুর সহিত বাস করিয়াও কোন সুফল প্রত্যাশা করিতে পারে না। তোমরা কি এই শ্রেণীর শিষ্য হইতে চাও ?" শিষ্যেরা উত্তর করিলেন—"না।" বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিষ্যদিগকে "উৎসঙ্গ-বদর" নাম দেওয়া যাইতে পারে। আঁচল ভরিয়া কুল গ্রহণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেগুলিকে না বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রোড়স্থিত আঁচলের সমস্ত কুল ভূতলে পড়িয়া যায় ; তদ্রূপ এক শ্রেণীর শিষ্যেরা গুরুগৃহে অবস্থান সময়ে গুরুর নানা গুণ বাহ্যতঃ লাভ করিয়া থাকে ; তখন তাহাদের বাক্যে, কার্য্যে ও ব্যবহারে সুজনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু গুরুর বিবিধগুণ ও উপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কোন চেষ্টা থাকে না বলিয়া, যখন গুরুর সঙ্গ হইতে তাহারা দূরে চলিয়া যায়, তখন তাহারা সেই ক্ষণস্থায়ী গুণগুলি উৎসঙ্গস্থিত বদরের ন্যায়

হারাইয়া ফেলে। তাহাদের প্রকৃতি তখন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৎসগণ, তোমরা কি এই শ্রেণীর শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর? উত্তর হইল "না।"

বুদ্ধ ধীরকণ্ঠে আবার কহিলেন—সৌম্যগণ, তৃতীয় প্রকারের শিষ্যদিগকে ঊৰ্দ্ধমুখ কুম্ভের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধমুখ কুম্ভ যেমন সহজেই সলিলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া থাকে, এই জাতীয় শিষ্যদের চিত্তও তেমনি অবাধে গুরুর উপদেশামৃতের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া অমৃতরসে ভরিয়া উঠে। পূর্ণকুম্ভের বারি যেমন তৃষিত তাপিতের পিপাসা ও তাপ দূর করে, এই শ্রেণীর শিষ্যদের হৃদ্‌কুম্ভস্থিত অমৃতরসও তেমনি শত শত পাপতাপ-জর্জ্জরিত নরনারীর পাপতাপ দূর করিয়া থাকে। তোমরা কি এই জাতীয় শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর? শিষ্যেরা বিনীতভাবে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"হাঁ।"

রাত্রি স্নিগ্ধতা ও স্তব্ধতা সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল। গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিষ্যেরা জলান্ত হইতে উচ্চ ভূমির উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। শ্রদ্ধানম্র শিষ্যেরা তাঁহাদের হৃদয়পাত্রের মুখ উন্মোচন করিয়া নিঃশব্দে গুরুর সম্মুখে ধারণ করিলেন। তিনি তাঁহার সত্যধর্ম্মের রসধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শিষ্যেরা হৃদয় দিয়া বুঝিলেন যে, এই সত্যধর্ম্মের আদিতে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ। গুরুর উপদেশে তাঁহাদের চিত্তের সমস্ত সংশয় দূর হইবামাত্র তাঁহারা (১) জগতে দুঃখের অস্তিত্ব, (২)

দুঃখের উৎপত্তিব কারণ (৩) দুঃখ-অতিক্রমের পন্থা এবং (৪) দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়, এই চতুরার্য্য সত্যের সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিলেন, জগতে সুখ দুঃখ আছে ইহা সত্য, দুঃখ উদ্ভবের কারণ রহিয়াছে ইহা সত্য, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় ইহা সত্য এবং দুঃখ দূর করিবাব উপায় আছে ইহাও সত্য। এই দুঃখ দূর করিবার জন্য—(১) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সম্যক্ সঙ্কল্প (৩) সম্যক্ বাক্ (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত (৫) সম্যগাজাব (৬) সম্যক্ব্যায়াম (৭) সম্যক্ স্মৃতি (৮) সম্যক্ সমাধি, এই আষ্টাঙ্গিক সাধনা আবশ্যক।

শিষ্যেরা বুঝিলেন, দুঃখের নির্ব্বাণ করিয়া পরমানন্দ, পরম-শান্তি লাভ করিতে হইলে যে সাধনা গ্রহণ করিতে হয়, তাহা প্রাণহীন বাহ্য অনুষ্ঠান নহে, সেই সাধনা গ্রহণ করিতে হইলে, সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য, কর্ম্ম, জীবিকা, ব্যায়াম, স্মৃতি, ধ্যান পবিত্র করিতে হইবে।

বিস্মিত আনন্দে বিনিদ্র শিষ্যগণ সমস্ত রজনী সমস্ত হৃদয় মন দিয়া গুরুর মুখে নবধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিলেন। অরুণোদয়ে আবার সুস্নাত-শুচি হইয়া গুরুব সহিত ঋষিপত্তনে ফিরিয়া আসিলেন। গুরুর নির্দ্দেশে তাঁহাবা সেইখানে একস্থানে প্রাঙ্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। গুরুর চরণে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহারা গুরুকে এবং তাঁহার উপলব্ধ মহাসত্যকে মানিয়া লইলেন। উত্তরকালে রাজর্ষি অশোক এই পবিত্র ভূমিতে নানা

কারুকার্য্য-খচিত একটি মনোহর স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপটি অধুনা "সারনাথ স্তূপ" নামে খ্যাত।

সপ্তম অধ্যায়

—o.—

নবধর্ম্মের প্রচার ও ব্যাপ্তি

পঞ্চ শিষ্যের মধ্যে কৌণ্ডিন্য প্রথমে নবধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি করেন। ক্রমে অন্য চারিজনও এই সর্ব্ব দুঃখনির্ব্বাপক কল্যাণময় ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাঁহারা যখন সর্ব্বান্তঃকরণে এই ধর্ম্মের সার সত্য স্বীকার করেন তখন বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, সদ্ধর্ম্ম গ্র করিয়া তোমরা নবজন্ম লাভ করিয়াছ, তোমরা পরস্পরকে সহোদর বলিয়া জানিও, প্রেমে তোমরা এক হও, পবিত্রতায় তোমরা এক হও, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠায় তোমরা এক হও।"

"সম্যক্ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া মানুষ যখন একাকী সত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তখনও সে মধ্যে মধ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখনও সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে; তজ্জন্য তোমরা পরস্পরের সহায় হইও, সহানুভূতি দ্বারা একে অন্যের সাধু চেষ্টার আনুকূল্য করিও। তোমাদের ভ্রাতৃবন্ধন পবিত্র হউক, তোমাদের এই "সংঘ" শ্রদ্ধাবান্‌দিগের মিলনভূমি হউক।"

সারনাথ স্তূপ
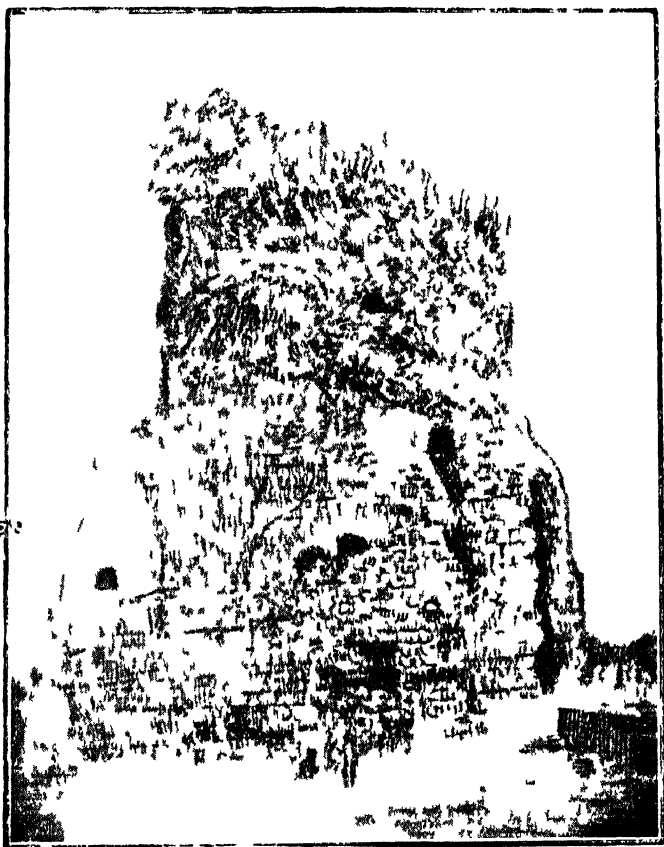
৪০ পৃঃ

এই সময়ে একদিন যশনামক কাশীধামের এক ধনবান্ বণিকের পুত্র সংসারে বীতরাগ হইয়া গোপনে রাত্রিকালে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করেন। ঋষিপত্তনে যেখানে ভগবান্ বুদ্ধ বাস করিতেছিলেন যুবক তাহারই সন্নিকটে আগমন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অহো, কি উপদ্রব। কি উপসর্গ!" বুদ্ধ স্নেহ-কণ্ঠে কহিলেন, এখানে কোন উপদ্রব নাই, কোন উপসর্গ নাই। তুমি আমার নিকটে আইস, আমি তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিব। যুবক বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া উপবেশন করিলেন, বুদ্ধ তাঁহাকে দুঃখনিবৃত্তির মঙ্গলবাণী শুনাইলেন। যশের জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইল; তিনি গভীর সান্ত্বনা লাভ করিয়া বুদ্ধের চরণে আপনাকে সমর্পণ করিলেন।

ধনীর পুত্র যশ মূল্যবান্ নানা অলঙ্কারে বিভূষিত ছিলেন বলিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছিলেন। বুদ্ধ বলিলেন,—"বৎস, ধর্ম্ম বাহিরের ব্যাপার নহে, ইহা মন হইতে উৎপন্ন হয়। মহামূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত ব্যক্তিও আপনার প্রবৃত্তিগুলি জয় করিতে পারেন; আবার গৈরিকধারী শ্রমণের চিত্তও সাংসারিক ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিমগ্ন থাকিতে পারে। সন্ন্যাসী ও গৃহী এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যিনি আপনার অহংবোধকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তিনিই কল্যাণময় সত্য লাভ করিয়া থাকেন।"

যশের পিতা পুত্রের সন্ধানে আসিয়া বুদ্ধের মধুর উপদেশ

শ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধের গৃহীশিষ্য হইলেন। যশ আর সংসারে ফিরিলেন না, তিনি নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সংঘে যোগদান করিলেন।

অল্পদিন মধ্যে বুদ্ধের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তাঁহার মুখে মধুর ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। শান্তিপ্রদ নির্ব্বাণলাভের জন্য কেহ কেহ প্রচলিত ধর্ম্মমত ত্যাগ করিয়া নবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কয়েক মাস মধ্যে বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা ষাট হইল। তিনি সমস্ত বর্ষা ঋতু শিষ্যদের লইয়া নবধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচনা করিলেন। সত্যান্বেষী শ্রাদ্ধান্যুগণের চিত্তে এই ধর্ম্মের মঙ্গলবাণী চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া গেল। বর্ষান্তে বুদ্ধ শিষ্যদিগকে কহিলেন "ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া এই আদিকল্যাণ, অন্তকল্যাণ নবধর্ম্মের নির্ব্বাণবাণী তোমাদিগকে দেশে দেশে দিকে দিকে প্রচার করিতে হইবে। তোমরা একদিকে দুইজন যাইও না। কামনার ধূলিজাল যাহাদের মনশ্চক্ষু আচ্ছন্ন করে নাই, তাহারা অনায়াসে এই ধর্ম্মের সত্য প্রত্যক্ষ করিবে। অমৃতের স্বাদ পাইলে মানব প্রবৃত্তির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণপথের যাত্রী হইবে। তোমরা অকুণ্ঠিত উৎসাহের সহিত মানবের ঘরে ঘরে পরিত্রাণের শুভবাণী প্রচার কর।"

বুদ্ধ স্বয়ং ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে উরুবিল্বের অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। শিষ্যেরাও গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিভিন্ন-দিকে প্রচারের জন্য বাহির হইলেন। উরুবিল্ব তখন জটিল সম্প্রদায়ভুক্ত অগ্নি-উপাসকদের প্রধান বাসভূমি ছিল। সুবিখ্যাত কাশ্যপ ইহাদের আচার্য্য ছিলেন। বুদ্ধ এই প্রবীণ আচার্য্যের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখকান্তি, মধুর ব্যবহার, সুখকর ও কল্যাণকর প্রসঙ্গ কাশ্যপকে মুগ্ধ করিল। বৃদ্ধ কাশ্যপ এই প্রতিভাশালী মহাপুরুষের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। তাঁহার অনুগত জটিলগণও বুদ্ধের শরণাপন্ন হইল। তাহারা তাহাদের অগ্নিপূজার বিবিধ পাত্রাদি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল।

উরুবিল্বে কাশ্যপের দুই ভ্রাতা নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ অদূরেই বাস করিতেন। তাঁহারা নদীস্রোতে প্রবাহিত পূজাপাত্র দেখিয়া চিন্তিতমনে অনুচরগণের সহিত ভ্রাতার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ সেই স্থানে ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দেন—“ভিক্ষুগণ, এই সবই জ্বলিতেছে। তৃষ্ণার অগ্নিতে, দ্বেষের অগ্নিতে ও মোহের অগ্নিতে এই সবই জ্বলিতেছে; জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ-শোক-দুঃখে এই সবই জ্বলিতেছে। এইরূপ ভাবিলে বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং চিত্তে বিমুক্তি লাভ করা যায়।” জটিলগণ বুদ্ধের মধুর উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ হইল এবং নবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কাশ্যপ ও অপর বহুসংখ্যক শিষ্যসহ বুদ্ধ উরুবিল্ব হইতে

রাজগৃহে গমন করিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বিম্বিসার, অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধের শান্তোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিবর্গ প্রীত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে নবধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার সেই উপদেশের মর্ম্ম এই—"সকল পাপপরিত্যাগ, কুশলকর্ম্ম-সম্পাদন ও চিত্তের পবিত্রতাসাধন, সংক্ষেপতঃ ইহাই ধর্ম্ম। জননী যেমন আপনার জীবন দিয়াও পুত্রকে রক্ষা করেন, যিনি সার সত্য অবগত হন, তিনিও তেমনি সর্ব্বজীবের প্রতি অপরিমেয় বিশুদ্ধ প্রীতি রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার হিংসাশূন্য, বৈরশূন্য, বাধাশূন্য প্রীতি, ইহলোক কেন, লোকান্তরেও পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই মৈত্রীময় ভাবের মধ্যে তিনি বিহার করিয়া থাকেন।"

এই সুমধুর ধর্ম্মবাণী শ্রবণ করিয়া মগধরাজ বিম্বিসারের অন্তর ভক্তিতে ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইল। বুদ্ধের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। বুদ্ধের ও তাঁহার অনুচরদিগের বাসের নিমিত্ত তিনি নগরের বহির্ভাগস্থ "বেণুবন" নামক একটি মনোহর ও নিভৃত উদ্যান দান করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের পঞ্চ শিষ্যের অন্যতম অশ্বজিৎ জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়া রাজগৃহে গুরুসমীপে প্রত্যাগমন করেন। তিনি একদিন ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন এমন সময়ে উগতীষ্য নামক এক জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক তাঁহার

সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। উপতীষ্যের মনে এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, এই ভিক্ষু সত্য পথের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বিনীতভাবে অশ্বজিৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য, আপনি কোন্ মহাত্মার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন ?" অশ্বজিৎ বুদ্ধের নাম করিলেন। উপতীষ্য বুদ্ধের ধর্ম্মমত শুনিবার নিমিত্ত আবার প্রশ্ন করিলেন। অশ্বজিৎ মনে করিলেন, উপতীষ্য নবধর্ম্মের মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত হয়ত তাহার সহিত বাক্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি সঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন "ধর্ম্ম বিষয়টি অতি গভীর। আমি বয়সে একান্ত অপ্রবীণ, আমি কিরূপে আপনার নিকটে ইহা ব্যাখ্যা করিব ?" উপতীষ্য কহিলেন—"মহাত্মন্, আপনার কোনপ্রকার সঙ্কোচের হেতু নাই, আপনি আপনার ধর্ম্মের বাণী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলে আমি পরম আনন্দলাভ করিব।" অতঃপর অশ্বজিতের মুখে নবধর্ম্মের মধুর কথা শুনিয়া উপতীষ্য এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ কালিতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি এতদিন পরে নির্ব্বাণপথের সন্ধান পাইয়াছেন। দুই বন্ধু অল্পদিন মধ্যেই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপতীষ্য "সারিপুত্র" এবং কালিত "মৌদ্গল্যায়ন" নাম লাভ করিলেন।

এই বন্ধুযুগল তাঁহাদের অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য অবিলম্বে সংঘমধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে এক পূর্ণিমারজনীতে ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্যগণ রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী এক গিরিগুহায় সমবেত হন। সম্মিলিত সাধুদের নিকটে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার সময়ে প্রারম্ভে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বপাপসৃস অকরণং কুসলসৃস উপসম্পদা।
সচিত্তপরিয়োদনং এতং বুদ্ধান সাসনং॥

সকলপ্রকার পাপের বর্জ্জন, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং চিত্তের নির্ম্মলতাসাধন, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

মগধপ্রদেশে অনেকে নবধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তত্রত্য রক্ষণ-শীলদের মধ্যে একটি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইল। তাঁহাবা বলিতে লাগিলেন—"শাক্যমুনি পতিপত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া সৃষ্টি বিলোপ করিবার উপক্রম করিয়াছেন।" তাঁহারা বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে বিদ্রূপস্বরে কহিলেন—"তোমাদের প্রভু যুবক-দিগকে যাদুমন্ত্রে বশ করিতেছেন,—এক্ষণে কাহার উপরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, তিনি সংপ্রতি কাহাকে যাদু করিয়া ঘরের বাহির করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন?" এই সব উক্তি শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন—'তোমরা চিন্তিত হইও না, এই অসন্তোষ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইতে পারে না, তোমরা বিদ্রূপ-কারীদের ধীরভাবে বলিও, বুদ্ধ লোককে সত্যপথে আহ্বান

করিয়া থাকেন, তিনি সংযম, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পরিত্রাণই প্রচার করিয়া থাকেন।”

এই সময়ে সুদত্তনামক এক সত্যানুরাগী ধনবান্ ব্যক্তি মহাপুরুষ বুদ্ধের সুযশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাব দর্শনলালসায় রাজগৃহে আগমন করেন। অমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এই পুণ্যশীল ব্যক্তির নিবাস কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীনগরে। তিনি দরিদ্রের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের শরণ ছিলেন। অনাথেব অন্নদাতা বলিয়া তিনি ‘অনাথপিণ্ডদ’ নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধ এই সাধুশীল ধনীর হৃদয়ের শোভনতার পবিচয় পাইয়া তাঁহাকে মধুর ধর্ম্মালাপে পরিতৃপ্ত করিলেন। বুদ্ধের হৃদয়স্পর্শী উপদেশ শুনিয়া অনাথপিণ্ডদ বিমুগ্ধ হইলেন; তিনি অকপটচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন—“প্রভূত সম্পদের অধিকারী বলিয়া আমার মন সর্ব্বদা চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, তথাপি কর্ম্ম করিয়া আমি আনন্দ পাইয়া থাকি, অনলসভাবে সর্ব্বদা আপনাকে নানাকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়া থাকি। বহুব্যক্তি আমার আশ্রয়ে কার্য্য করে এবং আমার সফলতার উপরে তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিয়া থাকে।”

“মহাত্মন্, আপনার শিষ্যেরা গৃহত্যাগী সাধুজীবনের শান্তির প্রশংসা এবং সাংসারিক জীবনের অশান্তির নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আপনি সর্ব্ববিধ সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীকে নির্ব্বাণলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।”

"প্রভো, বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও আমি লোকসেবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত আমাকে কি ধন, সম্পদ্, গৃহ ও ব্যবসায় বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইতে হইবে ?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন—'যিনি আর্য্যমার্গ অবলম্বন করিবেন, তিনিই শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। ঐশ্বর্য্যের উন্মাদনা যাহার চিত্ত অভিভূত করে তাহার পক্ষে উহা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু ধনের প্রতি যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনার সম্পদ্ লোককল্যাণে ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহার সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।"

আমি তোমাকে কহিতেছি—"তুমি সগৌরবে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার শক্তি ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রয়োগ কর। আমার ধর্ম্ম কাহাকেও অকারণে গৃহহীন হইতে বলে না। আমার ধর্ম্ম অহঙ্কার, মলিনতা ও ভোগবিলাস বর্জ্জন করিয়া সাধুপথে বিচরণ করিবার জন্য মানবকে আহ্বান করিয়া থাকে।"

"অনিকেতন ভিক্ষুও যদি নিরুদ্যম, নির্বীর্য্য, অলস ও বিলাস-প্রিয় হইয়া উঠেন, তাহা হইলে তিনিও কদাচ শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না"

"কি গৃহী, কি গৃহহীন যিনিই পবিত্র ধর্ম্মভাবনাদ্বারা চিত্ত আবৃত করিয়া রাখিবেন, যিনি আপনার সমগ্র চেষ্টা ধর্ম্মসাধনায় প্রয়োগ করিবেন. যিনি সরোবরের মধ্যবর্ত্তী প্লবমান শতদলের ন্যায়

সংসারের মধ্যে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিতে পারিবেন, তিনিই নিঃসন্দেহে আনন্দ, কল্যাণ ও শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।"

বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিয়া অনাথপিণ্ডদ পরম পুলকিত হইলেন। তিনি শ্রদ্ধানম্র-চিত্তে কহিলেন—"প্রভো, বৌদ্ধ সাধুদের বাসের নিমিত্ত আমি শ্রাবস্তী নগরে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।"

অনাথপিণ্ডদের হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। বুদ্ধ তাঁহার দিব্য দৃষ্টিদ্বারা এই পুণ্যব্রত ধনীর হৃদয়ের উদারতা দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন, তিনি তাঁহার দানগ্রহণে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—

"দানশীল ব্যক্তি সর্ব্বজনপ্রিয়, তাঁহার বন্ধুত্ব অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হয় না বলিয়া মৃত্যুতেও তিনি আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন। তাঁহার মঙ্গলব্রত-সম্ভূত বিকশিত পুষ্প ও রসাল ফল তিনি ইহলোকে ও পরলোকে লাভ করিয়া থাকেন।"

"অনেকেই ইহা বিশ্বাস করে না যে, নিরন্নকে অন্নদান করিলেই আমাদের বলবৃদ্ধি হয়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রে ভূষিত করিলেই আমাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, গৃহহীনদিগের জন্য গৃহনির্ম্মাণে অর্থ ব্যয় করিলেই আমাদের অর্থ বাড়িতে থাকে।"

"সুদক্ষ যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের সর্ব্ববিধ কৌশল অবগত বলিয়া

নিপুণতার সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া থাকেন, সাধুশীল বুদ্ধিমান্ দাতাও তেমনি কাল্যাকাল, পাত্রাপাত্র নির্ব্বাচন করিতে জানেন বলিয়া সুচারুরূপে তাঁহার পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ যে দাতার চিত্ত প্রীতি ও করুণার রসে অভিষিক্ত তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন; তাঁহার হৃদয় হইতে ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধ অন্তর্হিত হইয়া যায়।"

"দানশীল সাধুব মঙ্গলকর্ম্ম তাঁহার মুক্তির সোপান। তিনি তাঁহার মঙ্গলব্রতরূপ যে সরস বৃক্ষাঙ্কুব রোপণ করেন তাহা ভবিষ্যতে তাঁহাকে ছায়া, পুষ্প, ফল দান করিবেই।"

অনাথপিণ্ডদ কোশলে ফিরিবার সময়ে বিহারের স্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিবার নিমিত্ত সারিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ যখন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন লোকদ্বারা পুত্রকে জানাইলেন, "এক্ষণে আমি বৃদ্ধ, অল্পদিন মধ্যেই হয়তো আমাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে; মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাকে দেখিবার জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তোমার নবধর্ম্মের বাণী সহস্র সহস্র লোকে শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইতেছে; তোমার জনক ও স্বজনদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করিতেছ কেন?"

দূতমুখে পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বুদ্ধ অবিলম্বে কপিলবাস্তু যাত্রা করিলেন। তথায় নগরের সমীপবর্ত্তী একটি উদ্যানে তিনি সশিষ্য আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গৃহত্যাগের সাত বৎসর পরে পিতা পুত্রকে আবার সংসারে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিনীতভাবে কহিলেন—"আপনার হৃদয় স্নেহে অভিষিক্ত, আপনি আমার জন্য গভীর বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। যে অসীম স্নেহদ্বারা আপনি আমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, সেই স্নেহ সর্ব্বমানবের প্রতি প্রসারিত করুন, তাহা হইলে আপনি যে ক্ষুদ্র সিদ্ধার্থকে হারাইয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে এক বৃহত্তর সিদ্ধার্থকে লাভ করিতে পারিবেন এবং নির্ব্বাণের শান্তি আপনার চিত্ত অধিকার করিবে।"

পুত্রের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদনের চক্ষু ভারাক্রান্ত হইল। তিনি অভিনবভাবে বিহ্বল হইয়া বলিলেন—"তুমি সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া মহানিষ্ক্রমণ দ্বারা পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছ। তুমি নির্ব্বাণের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছ, তুমি এক্ষণে সর্ব্বজীবের নিকটে মুক্তির বাণী প্রচার কর।"

শুদ্ধোদন রাজধানীতে ফিরিলেন, বুদ্ধ নগরপুরোবর্ত্তী উদ্যানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে নগরে বাহির হইলেন। পুত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিতা শুদ্ধোদন দ্রুতগতি তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং অপ্রসন্ন চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, তুমি রাজতনয় হইয়া কেন উদারান্নের জন্য গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার

করিতেছ এবং আমাদিগকে লজ্জা দিতেছ ? আমি কি তোমার উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতাম না ?" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "ভিক্ষা করাই আমার কুলাগত প্রথা।" শুদ্ধোদন বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি বৎস, তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার বংশে কে কখন ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিয়াছেন ?" বুদ্ধ বলিলেন—"রাজন্, আপনি ও আপনার পিতৃপিতামহগণ রাজকুলে জন্মিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধদেব বংশেই জন্মলাভ কবিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ভিক্ষান্নে জীবন রক্ষা করিতেন।" শুদ্ধোদন নিব্বাক্ হইয়া রহিলেন। বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—"রাজন্ পুত্র যদি কোন অমূল্য রত্ন লাভ করে, সে স্বভাবতঃই সেই দুর্লভ রত্ন পিতার চরণে অর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে। আমি বহু সাধনার ফলে যে সুদুর্ল্লভ ধর্ম্মধন লাভ কবিয়াছি, সেই রত্নভাণ্ডার আজ আপনার সমীপে উদ্ঘাটিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সেই রত্ন গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের উপলব্ধ সত্য পিতৃ-সন্নিধানে ব্যাখ্যা করিলেন। শুদ্ধোদন নবধর্ম্মের অনুরাগী হইলেন। বুদ্ধকে লইয়া তিনি রাজভবনে গমন করিলেন। তথায় পুরবাসীরা সকলে মিলিত হইয়া বুদ্ধকে অভিবাদন করিলেন।

এই সম্মিলনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী গোপা উপস্থিত ছিলেন না। তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, গোপা স্বয়ং

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কোশলবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অনাথপিণ্ডদ শ্রাবস্তীনগরে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়া সারিপুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহ হইতে কোশলে যাত্রা করেন। তিনি শ্রাবস্তীনগরে উপস্থিত হইয়া বিহারের উপযোগী স্থাননির্দ্ধারণের নিমিত্ত নগরের উপকণ্ঠে ঘুরিতে লাগিলেন। বিবিধ বৃক্ষ ও স্রোতস্বিনীশোভিত একখানি রমণীয় উদ্যান তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কোশলরাজকুমার জেত এই উদ্যানের অধিকারী। অনাথপিণ্ডদ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—"এইখানেই সাধুদের নিবাসভূমি বিহার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।" তিনি রাজকুমারের নিকট অর্থ বিনিময়ে উদ্যানখানি পাইবার প্রার্থনা করিলেন। জেত অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সাধুশীল অনাথপিণ্ডদ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, তিনি উদ্যানখানি পাইবার নিমিত্ত ক্রমাগত আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র জেত সুযোগ পাইয়া, একটা অসম্ভব মূল্য চাহিয়া বসিলেন। প্রচলিত আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কহিয়াছিলেন—"যদি উদ্যান সুবর্ণমুদ্রার দ্বারা আবৃত করিতে পারেন তাহা হইলেই আপনি সেই মূল্যদ্বারা উদ্যান পাইতে পারিবেন, অন্যথা আমি আপনাকে কিছুতেই উদ্যান দিব না।"

অনাথপিণ্ডদ রাজকুমারের এই প্রকার অসম্ভব আদেশ শুনিয়াও পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহার আদেশে ভাণ্ডারের

দ্বার উন্মুক্ত হইল; পিতৃপিতামহের এবং তাঁহার আপনার আজন্মের সঞ্চিত অর্থরাশি শকটে বোঝাই করিয়া উদ্যানে আনীত হইতে লাগিল; স্বর্ণাস্তরণে উদ্যানের অর্দ্ধাংশ মণ্ডিত হইয়া ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে উদ্যানে উপস্থিত হইযা মুদ্রা ছড়াইতে বারণ করিলেন। অনাথপিণ্ডদের ত্যাগের মহান্‌ দৃষ্টান্তে তাঁহার চিত্তে শুভবুদ্ধি জাগরিত হইল। তিনি কহিলেন—"এই উদ্যান আপনারই হইল কিন্তু চতুর্দ্দিকের আম্র ও চন্দন তরুরাজি আমাবই রহিল, আমি এই সমুদয় বুদ্ধের চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহি।"

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ প্রভূত অর্থব্যয়ে বিহার নির্ম্মাণ করিলেন। রাজকুমার জেতও প্রাপ্ত অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া উক্ত অর্থে বিহারের চতুর্দ্দিকে চারিটি মনোহর অষ্টতল প্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন।

বৌদ্ধসঙ্ঘকে এই বিহার উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধকে শ্রাবস্তীনগরে আহ্বান করেন। তিনি পদব্রজে রাজগৃহ হইতে শ্রাবস্তীনগরে আগমন করিয়াছিলেন। নগরের সমস্ত নরনারী বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া অগ্রগামী হইয়া মহাপুরুষকে অভ্যর্থনা করিল। অগণন পুষ্পে আচ্ছাদিত এবং ধূপ, ধূনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধে আমোদিত বিহারমধ্যে বুদ্ধ প্রবেশ করিলেন। অনাথপিণ্ডদ পৃথিবীর সাধুদিগের বাসের নিমিত্ত

বিহারটি যথারীতি বুদ্ধের চরণে অর্পণ করিলেন। বুদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া সুধাকণ্ঠে কহিলেন—"সমস্ত অমঙ্গল দূর হউক, এই মহৎ দান ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য করুক ও এই দান সমস্ত মানবের ও দাতার কল্যাণের আকর হউক।"

অষ্টম অধ্যায়

অন্তিম জীবন

বার্দ্ধক্যের আক্রমণে মহাপুরুষ বুদ্ধেব দেহ এখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। এতদিন তিনি বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ, উৎকল বারাণসী, কোশল প্রভৃতি নানা রাজ্যে তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রচাব করিয়াছেন ; আর্য্য ও অনার্য্য উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

একদা শরৎকালে তিনি গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন ; এই সময়ে বিম্বিসারসুত অজাতশত্রু বৃজ্জিদিগকে বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপুরুষ

বুদ্ধের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী বর্ষকারকে কহিলেন, "মন্ত্রিন্ , তুমি জান আমি বৃজ্জিদের উচ্ছেদসাধনের জন্য তুমুল যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি ; মহাত্মা বুদ্ধ অদূরবর্ত্তী গৃধ্রকূট শৈলে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিও, তিনি তাঁহার উত্তরে যাহা বলিবেন, তুমি তাঁহার সেই উক্তি শ্রবণ করিয়া আসিয়া যথাযথ আমার নিকটে আবৃত্তি করিবে ; মহাপুরুষের বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইতে পারে না।"

মন্ত্রী বুদ্ধেব সমীপে গমন করিয়া রাজার বক্তব্য জানাইলেন। বুদ্ধ তাঁহার উপস্থায়ক আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "আনন্দ তুমি কি শোন নাই যে, বৃজ্জিরা পুনঃপুনঃ সাধারণ সভায় সম্মিলিত হইয়া থাকে ?"

আনন্দ উত্তর করিলেন—"হাঁ প্রভু, শুনিয়াছি।"

বুদ্ধ আবার বলিলেন—"দেখ আনন্দ, এইরূপে ঐক্যবন্ধন স্বীকার করিয়া যতকাল বৃজ্জিরা বারংবার সাধারণ সভায় মিলিত হইতে পারিবে, ততদিন তাহাদের পতন নাই, তাহাদের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। যতকাল তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করিবে, নারীদের সম্মান করিবে, ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, সাধু-দিগের সেবায় ও রক্ষায় উৎসাহী থাকিবে, ততদিন তাহাদের পতন নাই, ততদিন ক্রমশঃ তাহারা উন্নতি লাভ করিবে।" বুদ্ধ তখন মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া জানাইলেন—"আমি যখন বৈশালীতে

ছিলাম তখন আমি স্বয়ং বৃজ্জিদিগকে ঐ সকল সামাজিক মঙ্গলকর নিয়ম শিক্ষা দিয়াছি ; যতকাল তাহারা সেই উপদেশ স্মরণ রাখিয়া মঙ্গলপথে বিচরণ করিবে ততদিন তাহাদের অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত।"

মন্ত্রী চলিয়া যাইবার পরে রাজগৃহের ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমি আজ তোমাদিগের নিকট সঙ্ঘের মঙ্গলবিধি ব্যাখ্যা করিব। তোমরা প্রণিধান কর—"যতদিন তোমরা উপস্থানশালায় এক হইয়া মিলিতে পারিবে, সকলে সমবেতভাবে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করিবে, সংঘের সমস্ত কার্য্য সম্মিলিত হইয়া সম্পন্ন করিবে, অভিজ্ঞাত কুশলগুলি প্রতিপালনে সঙ্কুচিত হইবে না, অপরাক্ষিত নববিধিগ্রহণে ইতস্ততঃ করিবে, যতদিন তোমরা প্রবীণদিগকে শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবা করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ বিনীতভাবে মানিয়া চলিবে, যতদিন তোমরা কামলালসার অধীন না হইবে, যতদিন তোমরা ধর্ম্মসাধনায় আনন্দিত হইবে, যতদিন তোমাদের সন্নিধানে সাধুসমাগম হইবে, যতদিন অলসতা ও অনুত্তম পরিহার করিয়া তোমরা মনকে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিবে ততদিন তোমাদের পতনের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। অতএব হে ভিক্ষুগণ, তোমরা মন বিশ্বাসে ও বিনয়ে ভূষিত কর, তোমরা পাপাচরণে ভীত হও, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তোমাদের মন জাগরিত হউক। তোমাদের উৎসাহ

অবিচলিত ও চিত্ত অনলস হউক। তোমাদের বোধিলাভ হউক।"

গৃধ্রকূট ত্যাগ করিবার পরে বুদ্ধ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কিছুদিন নালন্দায় বাস করেন। সেখান হইতে তিনি পাটলি (পাটলিপুত্র) গ্রামে আগমন করেন। শিষ্যদের অনুরোধে তিনি এখানকার বিশ্রামশালায় কিছুকালের জন্য অবস্থান করেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনিবার জন্য একদিন সেখানকার উপাসকগণ সমবেত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্নেহকণ্ঠে কহিলেন—"প্রিয়, শিষ্যগণ, সাধুপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অমঙ্গলকারীরা পঞ্চবিধ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে:—প্রথমতঃ, দুষ্কৃতকারীকে কেহ বিশ্বাস করে না এবং সে নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া দারিদ্র্য আসিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। দ্বিতীয়তঃ, তাহার অপযশ অচিরে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, সমাজে তাহার কোনো স্থান নাই, যে কোনো সমাজেই তাহাকে চোরের ন্যায় গোপনে ভিড়ের মাঝখানে লুকাইয়া চলিতে হয়। চতুর্থতঃ, মৃত্যুতেও তাহার শান্তি নাই, অজ্ঞাত বিভীষিকা ও উদ্বেগ লইয়া তাহাকে মরিতে হয়। পঞ্চমতঃ, মৃত্যুর পরে তাহার মন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, দুষ্কৃতজনিত দুঃখ ও যাতনা তখন তাহার মনের অনুসরণ করিতে থাকে।"

"হে গৃহিগণ, সাধুপথে বিচরণকারী ব্যক্তিরাও জীবনে

বৈশালীর এক বিহারে বাস করিতেছিলেন। আরোগ্যলাভের পরে আনন্দ একদিন তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিলেন—"ব্যাধি আপনার দেহের অপূর্ব্বকান্তি হরণ করিয়াছে, আপনার সেই রোগের কথা মনে পড়িলে আমি এখনও চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া থাকি। তবে আমার মনে দৃঢ় ধারণা রহিয়াছে যে, সংঘরক্ষার উপায় না বলিয়া কদাচ আপনি মানবলীলা সংবরণ করিবেন না।"

বুদ্ধ কহিলেন—"আনন্দ, সংঘ আমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন? আমি অকপটভাবে সকলের কাছে আমার উপলব্ধ সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, কোনো কথাই ত গোপন করি নাই। আমি কখনো একথা মনে করি না যে, আমি এই সংঘের চালক অথবা এই সংঘ আমার অধীন। যদি কেহ এমন কথা মনে করেন, তিনি নেতার আসনগ্রহণ করিয়া সংঘকে দৃঢ়রূপে বাঁধিবার নিয়মপ্রণালী প্রণয়ন করুন। সংঘরক্ষার জন্য আমি কোনো বাঁধা নিয়মপ্রণালী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না। আনন্দ, আমি অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ, যাত্রার শেষ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি; আমার শরীর এখন ভগ্ন শকটের তুল্য হইয়াছে, জোড়াতাড়া দিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহাকে চালাইতে হইতেছে। আমার মন যখন বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গভীর ধ্যানের মধ্যে অবস্থান করে কেবলমাত্র তখনই আমার শরীর সুস্থ থাকে।"

"আনন্দ, আপনারাই আপনাদের নির্ভরের স্থল হও, অন্য

কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশা করিও না। আপনারাই আপনাদের প্রদীপ হও। ধর্ম্মই প্রদীপ, সেই প্রদীপ দৃঢ়হস্তে ধারণ কর, সত্যকে সহায় করিয়া নির্ব্বাণের সন্ধানে প্রবৃত্ত হও।"

"আনন্দ, আপনি আপনার প্রদীপ ও নির্ভরস্থল হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে করিও না। সংঘের ভিক্ষুগণ যদি ধর্ম্ম সাধনা দ্বারা আপনাদের অন্তরের নিগূঢ়প্রদেশে বাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা দৈহিক ক্লেশ, প্রবৃত্তির তাড়না এবং তৃষ্ণাসম্ভূত সর্ব্ববিধ দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিবেন।"

"আনন্দ, আমার মৃত্যু ঘটিলে সংঘের অনিষ্ট হইবে কেন? যাঁহাদের চিত্ত বোধিলাভের জন্য কৌতূহলী, যাঁহারা বাহিরের কোনোপ্রকার সহায়তার প্রত্যাশা না করিয়া অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত সত্যসাধনা দ্বারা নির্ব্বাণলাভের চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ চরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবেন।"

ভগবান্ বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণলাভের দিন সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিল। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া আছেন। একদিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে আনন্দকে কহিলেন—"আনন্দ, আমার পরিনির্ব্বাণলাভের শুভদিন অদূরবর্ত্তী!" এই সংবাদ শুনিয়া শোকে আনন্দের বুক ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তাঁহাকে শোকমুগ্ধ দেখিয়া বুদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"তুমি কি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছ? আমি কি বারংবার বলি নাই যে, লোকের প্রিয়বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ

ঘটিবেই ? যে জন্মগ্রহণ করিবে তাহারই মৃত্যু ঘটিবে ইহাই জগতের নিয়ম ; সুতরাং আমার পক্ষে চিরকাল বাঁচিয়া থাকা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে ?”

অতঃপর বুদ্ধের আদেশে আনন্দ বৈশালীর সন্নিকটবর্ত্তী ভিক্ষুদিগকে তথাকার বিহারে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। সমবেত ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বুদ্ধ বলিতে লাগিলেন—“ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদের নিকটে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি তোমরা তাহা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া সেই সত্যেরই সাধনা কর, মনন কর। যাহাতে এই সদ্ধর্ম্ম অনন্তকালস্থায়ী হইতে পারে সেই জন্য সর্ব্বত্র ইহার প্রচাব কর। সমগ্র মানব-জাতির সুখকর ও কল্যাণকর এই ধর্ম্ম যাহাতে অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে সেই উদ্দেশ্যে জীবের প্রতি অপ্রমেয় প্রীতিপোষণ করিয়া তোমরা এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাক।”

“গ্রহকে শুভাশুভের কারণ বলিয়া জানা, ফলিত জ্যোতিষে আস্থা এবং নানা চিহ্নাদি দেখিয়া ভবিষ্যতের শুভাশুভ কথন প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলিয়া জানিও।”

“যে ব্যক্তি মনকে বাঁধিবার সংযমরশ্মি একেবারে খুলিয়া দেয়, সে কোনদিনও নির্ব্বাণলাভ করিতে পারে না। তোমরা সংযত হইবে, মনকে ভোগবিলাসের উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিবে এবং মনকে প্রশান্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে।”

“তোমরা পরিমিত পানাহার করিবে এবং সংযতভাবে দেহের

যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইবে। প্রজাপতি যেমন পুষ্প হইতে প্রয়োজনানুযায়ী মধুটুকুমাত্র গ্রহণ করে, ফুলেব সুগন্ধ, শোভা ও দলগুলি বিনষ্ট করে না, তোমরাও তেমনি অন্যকে পীড়িত ও বিনষ্ট না করিয়া আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।”

“হে ভিক্ষুগণ, চাবিটি আর্য্যসত্য এতদিন আমরা বুঝি নাই এবং প্রাণগণে সাধন কবিতে পারি নাই বলিয়াই জন্মজন্মান্তর অসত্যপথে বিচরণ করিয়াছি।”

“আমি তোমাদিগকে যে ধ্যান ও সাধনা শিক্ষা দিয়াছি তোমরা সেই সাধন অভ্যাস কর। পাপের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করিতে থাক। সাধুপথে বিচরণ কর এবং শীলবান্ হও। তোমাদের অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হউক। জ্ঞানের প্রভাবে তোমাদের হৃদয় আলোকিত হইলেই তোমরা আষ্টাঙ্গিক পথ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণলাভ কবিতে পারিবে।”

“আমার পরিনির্ব্বাণলাভের দিন আসন্ন। আমি তোমাদিগকে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, সংযোগোৎপন্ন পদার্থমাত্রেরই ক্ষয় হইবে। যাহা অবিনশ্বর তাহারই সন্ধান কর। অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণপদ লাভ কর।”

আসন্নমৃত্যুর শান্তি ও গাম্ভীর্য্য যখন বুদ্ধের মন আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, সেই শুভমুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম সংক্ষেপে শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বৈশালীর উপস্থানশালায় প্রদত্ত তাঁহার এই অন্তিম উপদেশটির একটি স্বতন্ত্র বিশেষত্ব

আছে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাঁহার এই উপদেশটির একাংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাই সাধকের জন্য চারিটি ধ্যান, চারিটি ধর্ম্ম প্রচেষ্টা, চারিটি ঋদ্ধি-পাদ, পঞ্চনৈতিক বল, সপ্তবোধ্যঙ্গ ও আষ্টাঙ্গিকমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছে।

বৈশালী হইতে বুদ্ধ সশিষ্য কুশীনগরের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি ভণ্ডগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম ও ভোগনগর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার উদার ধর্ম্মমত শিষ্যদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কেহ তাঁহার বাণী স্বীকার করে ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরে কেহ কেহ আপন আপন বাণী তাঁহার নামে চালাইবার চেষ্টা করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় শিষ্যদিগকে তিনি বলিলেন—"যদি কেহ বলেন, আমি স্বয়ং বুদ্ধের মুখে এই বাণী শুনিয়াছি ; ইহাই সত্য, ইহাই বিধি, ইহাই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা ; তোমরা কখনো এইরূপ উক্তির নিন্দা বা প্রশংসা করিও না। ঐ উক্তির প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ অভিনিবেশ সহকারে শুনিবে ; উহার তাৎপর্য্য সম্যক্ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। ধর্ম্ম এবং বিনয়ের নিয়মের সহিত মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে। যদি তুলনা করিয়া দেখিতে পাও যে, ঐ উক্তির সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ও সংঘের নিয়মাবলীর কিছুতেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না, তাহা হইলে বুঝিবে, ঐ উক্তি আমার নহে,

কিংবা ঐ ব্যক্তি আমার বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।”

বুদ্ধ শিষ্যদিগকে আরো বিশদভাবে বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, কোন ব্যক্তি এরূপও বলিতে পারেন যে, আমি বুদ্ধের এই বাণীটি একদল ভিক্ষুর মুখে কিংবা কোন স্থানের স্থবিরদের মুখে অথবা কোনও এক বিদ্বান্ ভিক্ষুর মুখে স্বয়ং শুনিয়াছি। তোমরা সেই বাণীটির প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ, মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবে; ঐ বাণী ধর্ম্ম ও বিনয়ের সহিত মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে; যদি কোনোরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পার তাহা হইলে বুঝিবে ঐ বাণী আমার নহে কিংবা ঐ ব্যক্তি আমার বাক্যের নিগূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।”

বুদ্ধ সশিষ্য ভ্রমণ করিতে করিতে পাবাগ্রামের চুন্দনামক কোন কর্ম্মকারের আম্রকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র চুন্দ তথায় গমন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করিল। বুদ্ধের মুখে অমৃতময়ী ধর্ম্মকথা শুনিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়া সে তাঁহাকে পরদিন অনুচরগণসহ আপন ভবনে আহারের জন্য আহ্বান করিল। মৌনাবলম্বন করিয়া বুদ্ধ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

পরদিন চুন্দ ভিক্ষুদের সেবার জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন, পিষ্টক এবং শুষ্ক শূকর মাংস রন্ধন করাইল। বুদ্ধের নিয়ম ছিল যে, তিনি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের প্রদত্ত সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য গ্রহণ

করিতেন। আহারে উপবেশন করিয়া বুদ্ধ চুন্দকে কহিলেন—“হে চুন্দ, তুমি একমাত্র আমাকেই এই শূকরমাংস পরিবেষণ কর, ভিক্ষুদিগকে এই মাংস দিও না।” বলা বাহুল্য, বুদ্ধ কখনো মাংস আহার করিতেন না। এইগুরুপাক অনভ্যস্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া তিনি রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি কুশীনগরের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি পরম ধৈর্য্যের সহিত প্রসন্নমুখে রোগের যাতনা সহিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তিনি আনন্দকে কহিলেন—“আমি অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমার এই গাত্রাবরণ বস্ত্রখানি চারি ভাঁজ করিয়া বিছাইয়া দাও আমি কিছুকাল বিশ্রাম করিব।” বুদ্ধ শয়ন করিয়া আনন্দকে পানীয় জল আনিবার আদেশ করিলেন। জলপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পুক্কসনামক এক মল্ল যুবক ঐ স্থানদিয়া যাইতেছিলেন; তিনি সাধু আড়ারকালামের শিষ্য। তরুমূলে সমাসীন ভগবান্ বুদ্ধের প্রসন্নমুখের কান্তি দেখিয়া পুক্কস বিস্মিত হইলেন। তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া সবিনয়ে বলিলেন—“প্রভো, গৃহত্যাগী সাধুদের ধ্যানের প্রভাব কি চমৎকার, তাঁহারা কি আশ্চর্য্য মানসিক শান্তিই উপভোগ করিয়া থাকেন।” তাঁহার গুরু আড়ারকালামের অলৌকিক ধ্যানশক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য পুক্কস বলিলেন যে, একদা যখন তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন

তাঁহার অতি সন্নিকট দিয়া ঘর্ঘর শব্দ করিয়া ধূলি উড়াইয়া পাঁচ শত শকট চলিয়া গেল, তাঁহাব পবিচ্ছদ ধূসবিত হইল, কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না।"

তাঁহার কথা শ্রবণ কবিয়া বুদ্ধ উল্লসিত হইয়া বলিলেন— "পুক্কস ধ্যানের শক্তি অতি আশ্চর্য্যই বটে, মানব ধ্যানের প্রভাবে মনেব মধ্যে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও বাহিরের কিছু দেখিতে বা শুনিতে পায় না। আমি এক সময়ে ধ্যানে নিযুক্ত ছিলাম ; তখন বাহিবে ভীষণ বাবি-বর্ষণ, মেঘ-গজ্জন ও বিদ্যুৎ স্ফুবণ হইতেছিল ; এই দুর্য্যোগে উক্ত স্থানে দুইজন কৃষক ও চাবিটি বলীবর্দ্দ প্রাণত্যাগ কবে। বাহিরে কি ঘটিতেছিল, তাহাব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম বলিয়া এই সকল দুর্ঘটনার কিছুই জানিতে পারি নাই। অতঃপর ধ্যানান্তে একস্থানে বহুসংখ্যক লোকের সম্মিলন দেখিয়া আমি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঐস্থানে এত লোক মিলিত হইয়াছে কেন ?" সে ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল,—"কেন, আপনি ত এখানে ছিলেন, আপনি জানিতে পারেন নাই যে, এই দুর্য্যোগে দুইজন কৃষকের ও চাবিটি বলীবর্দ্দের মৃত্যু ঘটিয়াছে ?" আমি এই বিষয় কিছুই অবগত নহি, ইহা শুনিয়া সে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল—আপনি যদি অবিরত বৃষ্টিপতন ও মেঘগর্জ্জনের শব্দ শুনিয়া না থাকেন তাহা হইলে আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন ?" উত্তর করিলাম—"আমি সম্পূর্ণ জাগরিত

ছিলাম।” আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া সে ব্যক্তি অবাক্ হইয়া রহিল।

বুদ্ধের অনন্যসুলভ ধ্যানশক্তির কথা শুনিয়া পুক্কস তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

পুক্কসেব অভিপ্রায়-অনুসারে একব্যক্তি সোনালি রঙ্গের দুইটী মনোহব পরিচ্ছদ আনয়ন করিল। তিনি ঐ পোষাক দুইটি লইয়া ভগবান্ বুদ্ধেব সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন—“প্রভো, আপনি এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলে আমি পরম প্রীতিলাভ করিব।” বুদ্ধ বলিলেন—“পুক্কস, তুমি আপন হস্তে একটি পোষাক আমাকে ও একটি আনন্দকে পরাইয়া দাও।” তিনি তাহাই করিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে মধুর ধর্ম্মোপদেশে পরিতৃপ্ত করিলেন।

অতঃপর বুদ্ধ ভিক্ষুগণসহ আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কুকুত্থানাম্না এক নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া স্নান ও জল পান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলেন। এখানে এক আম্রকুঞ্জে বিশ্রাম করিবার সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আনন্দ, পরিনির্ব্বাণলাভের শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে। দেখ, আমার মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া কেহ হয়ত এই কথা বলিয়া চুন্দের মনে বেদনা জন্মাইতে পারেন যে, তাহারই অন্নগ্রহণ করিয়া আমার জীবনবিয়োগ ঘটিয়াছে। কিন্তু তুমি চুন্দকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিও—“চুন্দ, তথাগত

তোমারই হস্তে শেষ আহার গ্রহণ করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। ইহা তোমার পক্ষে পরম মঙ্গল, পরম লাভ। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, জীবনে দুইটী মাত্র মহৎ ভোজ্য তিনি দানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এই দুইটী ভোজ্যই তিনি তুল্য কল্যাণকর মনে কবিয়াছেন। সুজাতার হস্তে মহামূল্য আহার গ্রহণ কবিয়া তিনি বোধিলাভ করিয়াছিলেন। অপর একদিন তোমারই হস্তে শেষ আহার গ্রহণ করিয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

"চল আনন্দ, আমরা কুশীনগরেব উপপত্তনে শালবনে গমন করি।" যথাসময়ে ভিক্ষুগণসহ বুদ্ধ মল্লদের শালকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, আনন্দ দুইটী পল্লবিত শালতরুর অবকাশস্থলে উচ্চমঞ্চে শয্যা রচনা করিলেন। বুদ্ধ উত্তবশীর্ষ হইয়া তথায় শয়ন করিলেন এবং আনন্দকে ধীর-কণ্ঠে কহিলেন, "আজ রাত্রির শেষ প্রহবে আমার পরিনির্ব্বাণ লাভ হইবে। তুমি কুশীনগরের মল্লদিগের নিকটে অবিলম্বে এই সংবাদ প্রেরণ কর।"

এই সময়ে সুভদ্রনামক এক জিজ্ঞাসু পরিব্রাজক কুশীনগরে অবস্থান করিতেছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের আগমন ও আসন্নপরি-নির্ব্বাণলাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি একান্ত উৎসুকচিত্তে ধর্ম্ম-বিষয়ক কয়েকটি সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। শালকুঞ্জে আগমন করিয়া সুভদ্র বুদ্ধের

সমীপবর্ত্তী হইবার উদ্যোগ করিলেন। আনন্দ তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া জানাইলেন, "মহাত্মন্, ভগবান্ বুদ্ধ এখন নিরতিশয় ক্লান্ত আছেন,আপনি এমন সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না।" সুভদ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বুদ্ধ কহিলেন—আনন্দ, সুভদ্রকে আমার কাছে আসিতে বারণ করিওনা, তাহাকে এইখানে আসিতে দাও।

সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিজ্ঞাত নানা বিরোধী ধর্ম্মমত জ্ঞাপন করিলেন এবং আপনার মনের সংশয় নিবেদন করিয়া মৌনী হইলেন। বুদ্ধ বলিলেন, সুভদ্র, তোমার প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার সময় আমার নাই। আমি তোমাকে সত্য শিক্ষা দিব, তুমি প্রণিধান কর ঃ—

যে ধর্ম্মে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি এই অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ নাই সেই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে শ্রমণ থাকিতে পারে না। এই আষ্টাঙ্গিক পথে বিচরণ করিয়া ধর্ম্মার্থীরা কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। সুভদ্র, আমি ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া কল্যাণের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরিব্রাজকরূপে বিরাট্ ধর্ম্মক্ষেত্রে আমি একান্ন বৎসংকাল বিহরণ করিয়াছি। আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গ ব্যতীত সদ্‌ধর্ম্মসাধনের আমি দ্বিতীয় কোনো পন্থা জানি না।

সুভদ্র বিস্ময়াভিভূত হইয়া উত্তর কহিলেন—"প্রভো, আপনার শ্রীমুখের বাণী অতীব মধুর। আপনার প্রসাদে আজ সত্য

বিচিত্র-রূপে আমার নিকট প্রকাশিত হইল। পথভ্রান্ত পথ পাইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা প্রকাশিত হইল, আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার অন্তর্হিত হইল। প্রভো, আমাকে আপনার জীবিতকালেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। বুদ্ধের আদেশক্রমে সুভদ্র সংঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন।”

অতঃপর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“আনন্দ, আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের কেহ চালক রহিলেন না, এমন চিন্তা যেন কদাচ তোমাদের মনে স্থান পায় না। আমি তোমাদিগকে যে সকল সত্য শিক্ষাদান করিয়াছি, সেই সকল সত্য এবং সংঘের নিয়মাবলীই তোমাদের পরিচালক হইবে।”

“আনন্দ, এতকাল সংঘের ভ্রাতৃগণ পরস্পর বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; কিন্তু এখন হইতে যেন বয়ঃকনিষ্ঠ নবীন ভিক্ষুরা প্রাচীন ভিক্ষুদিগকে “ভন্তে বা আয়স্মা” অর্থাৎ মাননীয় বা পূজনীয় বলিয়া সম্বোধন করেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরা নব্য ভিক্ষুদিগকে নাম বা গোত্র উল্লেখ করিয়া “আবুসো” অর্থাৎ বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিবেন।”

অনন্তর তিনি ভিক্ষুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—, “ভিক্ষুগণ, আমার প্রচারিত ধর্ম্মের কোনো বিষয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে, আপনারা তাহা অকপটে প্রকাশ করুন।” বুদ্ধ একবার দুইবার, তিনবার এইরূপ প্রশ্ন করিলেন, তথাপি ভিক্ষুগণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে আনন্দ বলিলেন,—"প্রভো, আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন বিষয়ে কাহারোও মনে দ্বৈধ নাই।"

পরিশেষে বুদ্ধ সুদৃঢ়কণ্ঠে ভিক্ষুদিগকে বলিলেন,—"সংযোগোৎপন্ন দ্রব্যমাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, আপনারা অবিচলিত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ পদ লাভ করুন।"

ইহাই মহাপুরুষ বুদ্ধের শেষ বাণী। উল্লিখিত বাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার সেই মহাধ্যান আর ভঙ্গ হইল না—তিনি ধ্যানপ্রভাবে আনন্দলোকে মহাপ্রস্থান করিলেন।

বাণী

বুদ্ধ—উপদেষ্টা

৭৯ পৃঃ

ভগবান্ বুদ্ধের সার্ব্বভৌমিকতা

সমগ্র পৃথিবী যাঁহাদিগকে মহামানব বলিয়া বন্দনা করিয়া থাকে, তাঁহাদেব জীবন ও বাণী অবলম্বনে ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে বিবাজ কবিযা থাকেন। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ভাষায়-আচারে, আকারে-বর্ণে, গুণে মানুষে মানুষে বৈষম্য আছে এবং চিরকালই থাকিবে। এত সব ভেদবিভেদ-সত্ত্বেও মানুষের আত্মা দেশদেশান্তরের মানবেব সহিত আপনার ঐক্যানুভূতি নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ যে সমাজের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই সমাজ তাহার মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। দেশাচার, লোকাচার এবং বংশগৌরব ইত্যাদি নানা কৃত্রিম ব্যবধান ধর্ম্মের নাম ধারণ করিয়া তাহার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এক একটি সমাজ বা সম্প্রদায় এমনি করিয়া শত শত নরনারীকে আপন আপন পরিকল্পিত প্রাচীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে। অভ্যস্ত ও সুপরিচিত সীমার মধ্যে চলিয়া-ফিরিয়া মানুষের বুদ্ধি এমন জড়তাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে যে, গণ্ডীর মধ্যে বাস করাই সে সুখকর বলিয়া মনে করে এবং গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরের সহিত আপনার যোগসাধন করিবার নিমিত্ত কোনো উৎসাহ বোধ করে না। এইরূপ দেখা যায় যে,

প্রত্যেক সমাজের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক-এক জন প্রতিভাশালী মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহাদের মঙ্গলবুদ্ধি কখনো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে স্বীকার করে নাই, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এমন এক উদার রাজবত্মে দাঁড়াইয়া মানুষকে আহ্বান করেন যে, সেখানে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে কোনো দেশের কোনো কালের মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে না।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধ মুক্তির এমনি একটি উদার রাজপথে বিশ্বের সকল মানবকে আহ্বান করিয়াছিলেন ; সেখানে সমবেত হইতে কোনো মানুষের চিত্ত বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। তিনি তাঁহার অনুগামী শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন —গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদী নানা দিগেদশ হইতে উৎপন্ন হইয়াও, যেমন সমুদ্রে মিলিয়া আপনাদের স্বতন্ত্র সত্তা ও নাম হারাইয়া ফেলে, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকল-জাতীয় মানব সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিবামাত্র তাহাদের জাতি ও গোত্র হারাইয়া থাকে। ক্ষৌরকার উপালি হীনজাতি হইয়াও মহা-পুরুষ বুদ্ধের দক্ষিণহস্ত হইলেন ; নবধর্ম্মের মহিমায় তিনি আর শূদ্র রহিলেন না, তিনি পরম সাধু, অর্হৎ এবং সত্যধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা হইয়া পরম সম্মান লাভ করিলেন।

বুদ্ধের বাণী এক সময়ে ভারতীয় পতিতদিগের কর্ণে অভয়-মন্ত্র শুনাইয়াছে এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম তাহাদিগকে আশ্রয়

দান করিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। থেরগাথায় একজন থের নিজ মুখে আপনার জীবনকাহিনী এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ—নীচ কুলে আমার জন্ম, আমি দীন দ্ররিদ্র ছিলাম, আমার ব্যবসায়ও অতি নীচ ছিল। লোকে আমাকে অবজ্ঞা করিত। আমি অবনতমস্তকে সকলকে সম্মান দেখাইতাম। অতঃপর আমি মহানগরী মগধে ভিক্ষুসমভিব্যাহারী মহাপুরুষ বুদ্ধের দর্শন পাই। তাঁহার দর্শনমাত্র আমার চিত্ত ভক্তিতে অবনত হইল, আমি মাথার বোঝা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। সেই লোকশ্রেষ্ঠ আমার প্রতি করুণা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, আমি তাঁহার অনুগামী শিষ্য হইবার অধিকার চাহিলাম। করুণাময় প্রভু তৎক্ষণাৎ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—আইস সাধু, আমার সহিত আইস।

বুদ্ধের জীবনকাহিনী পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অসঙ্কোচে পতিতা বারাঙ্গণা আম্রপালীর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া লিচ্ছবিরাজগণ অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। মহাপুরুষের করুণার শুভ্ররশ্মি-সম্পাতে পতিতা নারীর চিত্তশতদল নিমেষ মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং তাহার মনোহর সুগন্ধ সমগ্র বৌদ্ধসমাজকে বিস্মিত করিয়াছিল।

সকল মানবের বরণীয় এই মহাগুরু অনর্থকর জাতিভেদ, ধন-

গৌরব, পদগৌরব প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিতেন বলিয়াই উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, আর্য্য-অনার্য্য সকলের চিত্তে তাঁহার বাণী অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার বাণী সার্ব্বভৌম বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভারতের পতিত জাতি উহা আনন্দে গ্রহণ করিয়াছিল।

হাঁ, একথা স্বীকার্য্য যে ভগবান্ বুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণকে তুল্যরূপে সম্মান দেখাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন কাহাকে? ধর্ম্মপদে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"যিনি গভীর-প্রজ্ঞ, মেধাবী, সত্যাসত্য পথপ্রদর্শনে পণ্ডিত, উত্তমপদ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলি।"

"আপনার দুঃখের ক্ষয় হইয়াছে জানিয়া, যিনি এই সংসারেই ভারশূন্য ও বন্ধনমুক্ত তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।"

"যিনি বৈরীদিগের সহিত মিত্রভাব দেখাইয়া থাকেন, দণ্ডবিধানকারীর প্রতি সন্তোষভাব দেখাইয়া থাকেন এবং সংসারী-দিগের মধ্যে অনাসক্ত আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলি।"

মহাপুরুষ বুদ্ধের মতে বাহ্য কোনো কারণে কিংবা আকস্মিক জন্ম হেতু কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ধর্ম্মপদে উক্ত হইয়াছে—

"জটাধারণ দ্বারা এবং জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যিনি ধর্ম্মে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত তিনিই শুচি ও ব্রাহ্মণ।"

সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভগবান্ বুদ্ধ বংশানুগত জাতিভেদকে আদৌ গ্রাহ্য করিতেন না।

"বৃষলসূত্রে" তিনি তাঁহার এই অভিমত অতি সুস্পষ্ট ভাষায় অগ্নিভরদ্বাজের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জন্ম হেতু কেহ ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হয় না, কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ ব্রাহ্মণ, কর্ম্ম দ্বারাই মানুষ চণ্ডাল হইয়া থাকে। উক্তসূত্রে তিনি চণ্ডালের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"যে পাপাচার, কপটী, ক্রোধী ও হিংসক, যে অসত্য দর্শন আশ্রয় করিয়াছে; যে মায়াবী, যে সর্ব্বদা প্রবঞ্চনা করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।"

"যে ব্যক্তি নিজ হস্তে পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবদিগকে হিংসা করে, যে নিষ্ঠুর, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।"

"যে অকারণ অন্যকে নিগৃহীত করে, যে পরের ধন অপহরণ করে, যে ঋণগ্রস্ত হইয়া সেই ঋণ অস্বীকার করে, যে অর্থলোভে অন্যের জীবন নাশ করে, যে ব্যভিচার করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।"

"যে অতীত-যৌবন ও জরাক্লিষ্ট জনকজননীর সেবা করে না, বাক্যবাণে স্বজনদিগকে জ্বালাতন করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।"

"লোকে ভাল পরামর্শ চাহিতে আসিলে, যে মন্দ পরামর্শ দেয়, সত্য গোপন করিয়া যে মিথ্যা বলে, সেই ব্যক্তি চণ্ডালের প্রধান।"

"যে ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপন মুখে আপনার প্রশংসা করে, ঘৃণাপূর্ব্বক অন্যকে নিন্দা করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডাল।"

সাধুশীল শ্বপচও ইহলোকে এবং পরলোকে কিরূপ সুখশান্তি লাভ করে, বুদ্ধ তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মাতঙ্গ নামক এক চণ্ডালনন্দন কামক্রোধাদি বিসর্জ্জন করিয়া পরম সাধু হইয়াছিলেন। তাঁহার অনন্য-সুলভ যশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়ায় দলে দলে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় আসিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিত। মৃত্যুর পরে তিনি মহানন্দে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অধ্যাপককুলজাত এক ব্রাহ্মণনন্দন বেদমন্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াও পাপাচারী হইয়াছিল। সে ইহলোকে কদাচ শান্তি লাভ করে নাই, পরলোকেও নিরয়-গামী হইয়াছিল। কুল ও বেদজ্ঞান তাহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

বুদ্ধের জ্ঞানগর্ভ সরল বাণী অগ্নিভরদ্বাজের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি জাতিগোত্রের অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন।

সমাজ যাহাদিগকে পতিত বলিয়া উপেক্ষা করিত, বুদ্ধ কদাচ তাহাদিগকে পতিত বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। তিনি সকলের বোধগম্য সরল আখ্যানের দ্বারা দেশপ্রচলিত ভাষায় তাহাদিগকে নির্ব্বাণের অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি পতিতকে টানিয়া তুলিলেন, পথভ্রান্তকে পথ দেখাইলেন, অন্ধ-কারে নিমজ্জিত চক্ষুষ্মান্‌দিগের সম্মুখে করুণার রসধারাপূর্ণ প্রজ্বলিত জ্ঞানের প্রদীপ ধারণ করিলেন।

বুদ্ধ— অমিতাভ

১১২ পৃ:

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অভ্যুদয়-মাত্রেই এই ধর্ম্ম অনার্য্যপ্রধান মগধে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল ; এবং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যখন এই অনার্য্যপ্রধান মগধের রাজশ্রীর সম্মুখে সমস্ত ভারত মাথা নত করিয়াছিল, তখনই রাজশক্তির পৃষ্ঠ-পোষণে বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত ভারতের ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল।

মহাপুরুষ বুদ্ধের চিত্ত যদি কোনো কৃত্রিম বাধাকে স্বীকার করিত, তাহা হইলে কিছুতেই এই ধর্ম্ম পতিতকে নবপ্রাণ দান করিতে পারিত না এবং গিরিনদীসমুদ্র প্রভৃতি নৈসর্গিক বাধা লঙ্ঘন করিয়া নানাভাষাভাষী জনগণের বিচিত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত না। বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর একটী প্রধান ধর্ম্মে পরিণত হইয়া ইহার অত্যুচ্চ উদারতারই সাক্ষ্য দান করিয়াছে। বুদ্ধের বাণী এক সময়ে ভারতে অমৃতসেচন করিয়া অত্যাশ্চর্য্য সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের সেই অতীত যুগের সভ্যতাভাণ্ডার হইতে এখনো সর্ব্বদেশের সুধীগণ নব নব রত্ন-আহরণের চেষ্টা করিতেছেন। মহাপুরুষ বুদ্ধ যাহা দান করিয়াছেন, তাহা সার্ব্বভৌম বলিয়া সর্ব্ব পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছে এবং চিরকাল করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

বুদ্ধের আহ্বান

আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনোখানে সীমারেখা টানিবার উপায় আর নাই। যাহা চরম সত্য তাহা একসময়ে মানুষেব কাছে আপনি প্রকাশিত হয়, কিংবা সেই অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে সাধনাব শেষে সাধক একদিন স্বয়ং উপস্থিত হন। মানুষের বাক্য ইহাকে আকাব দান করিয়া অন্যের কাছে উপস্থিত করিতে পারে না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যাঁহারা এই অনির্ব্বচনীয় লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা অন্যকে এই পথের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় চরমকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিবেন কি করিয়া? বুদ্ধ বলেন, সাধক আপনারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজের অধ্যবসায়ে সমস্ত পথ অতিক্রম কবিয়া যাত্রার শেষে চরমে উত্তীর্ণ হইবেন। এইজন্য দৃঢ়কণ্ঠে সাধকদিগকে তিনি কহিতেছেন—তোমরা আপনারা আপনাদের নির্ভরের দণ্ড হও, অন্য কাহারো উপর তোমরা নির্ভর করিও না। তিনি মানবকে অনির্ব্বচনীয় রহস্যের কথা না বলিয়া নির্ভয়ে তেজের সহিত আহ্বান করিয়া যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই—

তোমাদিগকে অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের মধ্যে আসিতে হইবে, তোমাদিগকে রোগশোকজরামৃত্যু হইতে নির্ব্বাণের শান্তির

মধ্যে আসিতে হইবে। হে নির্ব্বাণপথের যাত্রিদল, তোমরা আমার নিকট চলিয়া আইস, আমি তোমাদিগকে নিববাণের সরল পথ দেখাইয়া দিব। সে পথের কোনো রহস্য আমাব অবিদিত নাই।

মহাপুরুষ বুদ্ধের যাহা বক্তব্য, তাহা তিনি এমন সুস্পষ্ট করিয়া অসঙ্কোচে অনন্যসুলভ সরলতা ও প্রাঞ্জলতার সহিত বলিয়াছেন যে, তাহা অনায়াসে মানবহৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আবার যাহা পাওয়া যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু যাহা বাক্যে বলা যায় না, তাহার সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নির্ব্বাক্ ছিলেন। তিনি সর্ব্বমানবকে ডাকিয়া কহিয়াছেন —তোমরা জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হও; রোগ যাহাদিগকে পীড়া দেয়, দুঃখশোকের বাণে যাহাদের হৃদয় বিদ্ধ হয়, নিদ্রা কি তাহাদের শোভা পায়? তোমরা জড়তা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হও, শান্তিলাভের জন্য তোমরা অনলস দৃঢ়তা অবলম্বন কর; তোমাদিগকে প্রমত্ত জানিয়া মৃত্যুরাজ তোমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাবধান, তিনি যেন তোমাদিগকে মূঢ় প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার অধিকারে লইয়া না যান।

তোমরা শুভমুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতে দিও না, দেবমানব যে বাসনার অধীন, তোমরা ত্বরায় সেই বাসনাকে জয় কর; সুযোগ হারাইলে নিরয়গামী হইয়া একদিন তোমাদিগকে অনুতাপ করিতেই হইবে।

প্রমাদই কলুষতা, অতএব অপ্রমাদ ও জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কামনার শরটি তুলিয়া ফেল।

বুদ্ধের সহজ বাক্যগুলি কি ঋজু, কি হৃদয়স্পর্শী! তিনি মানবের নিকটে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইয়া অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—আমি তোমাকে যে ধর্ম্মে আহ্বান করিতেছি, তাহা মঙ্গল, তাহা অনবদ্য, তাহা সুধীজনের নিকট প্রশস্ত। এই ধর্ম্মাচরণ করিলে তুমি সুখ ও কল্যাণ লাভ করিবে। আইস হে মানব, তুমি আমার নিকটে আইস, আমি তোমাকে সেকালের কোনো পুরাতন কথা বলিব না, আমি তোমাকে কোনো দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা বলিব না, আমি তোমাকে পরের কথায় বিশ্বাস করিতে বলিব না; আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা তুমি নিজের চক্ষু দিয়া দেখিয়া লও, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া গ্রহণ কর, ইহার সুফল তুমি অবিলম্বে বুঝিতে পারিবে; আমি যাহা বলিব তাহা সমস্ত সুস্পষ্ট ও সমস্ত সুপ্রত্যক্ষ।

ভগবান্ বুদ্ধের বাণী যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাঁহারা ইহার অসামান্য সবলতায়, তেজস্বিতায় ও সুযুক্তিতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। সূর্য্যালোক যেমন ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশিত করিয়া দেয়, মহাপুরুষ বুদ্ধের স্থির প্রজ্ঞার বিমল আলোক তেমনি মানবের সাধনমার্গের সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে।

শাস্ত্রবিধি ও লোকাচারের কাছে আপনার বুদ্ধি ও যুক্তিকে

বলি দিয়া মানুষ যে সহজ সত্য বিস্মৃত হইয়াছিল, ভগবান্ বুদ্ধের নির্ম্মল বোধ সেই সত্যকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি দার্শনিকতার দিকে, পাণ্ডিত্যের দিকে না যাইয়া, সকলের উপযোগী ভাষায় তাঁহার সুখকর, কল্যাণকর ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বেদবেদান্তশাস্ত্রের আশ্রয় ছাড়িয়া দেশবাসীর ন্যায়বুদ্ধি, সাধারণ যুক্তি এবং তাহাদেরই কথিত ভাষায় শরণ লইলেন। বুদ্ধ যাহা বলিলেন, তাহা একান্ত সরল বলিয়া মানবের চিত্ত, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি অসঙ্কোচে তাহাতে সায় দিল। এইজন্যই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত সর্ব্ব বাধা অতিক্রম করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত এসিয়াখণ্ডের ধর্ম্ম হইয়াছিল।

বুদ্ধ মানবকে কোনো ব্যর্থ আশা না দিয়া, খোলাখুলি বলিয়া দিলেন—"তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং", অর্থাৎ তোমার নিজেকেই উদ্যমের সহিত মঙ্গল আচরণ করিতে হইবে, তোমাকেই আষ্টাঙ্গিক সাধুপথ ধরিয়া চলিতে হইবে, তোমাকেই ধ্যানপরায়ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে, আমি কেবল পথের পরিচয় দিতে পারি মাত্র। তোমাকে জাগরিত হইতে হইবে; তুমি আলস্য-পরায়ণ হইলে চলিবে না। তোমার চিত্তকে ও সঙ্কল্পকে জাগাইয়া তোল, কারণ "কুসীদপঞ্ঞ্ঞায় মগ্গং অলসো ন বিন্দতি" অর্থাৎ নির্ব্বীর্য্য ও অলস ব্যক্তি জ্ঞানপথ লাভ করিতে পারে না।

বুদ্ধ বলিলেন—তুমি বাক্যে ও মনে সংযত হও, শরীর দ্বারা

কোনো পাপ করিও না, এইরূপ করিলে দেহে, বাক্যে ও মনে পবিত্র হইয়া তুমি ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে পারিবে। পাপাভিলাষ হইতে তুমি তোমার চিত্তকে উদ্ধার কর। মহান্ জলপ্রবাহ যেমন সুপ্ত গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া যায়, পাপপ্রমত্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু তেমন করিয়া নিজ অধিকারে লইয়া যায়।

হে নির্ব্বাণকামী মানব, ধর্ম্মকে তোমার বিচরণের প্রমোদ-কানন কর, ধর্ম্মকে তোমার আনন্দ কর, ধর্ম্মে তোমার প্রতিষ্ঠান হউক, ধর্ম্মই তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় হউক, যাহাতে ধর্ম্ম ম্লান হইতে পারে এমন কোনো বিতণ্ডা তোমার মনে স্থান দিও না এবং সুভাষিত সত্যালোচনায় তোমার সময় অতিবাহিত হউক।

হে নির্ব্বাণপথের যাত্রী, তুমি স্থিরধী ও সুপণ্ডিত সাধুর সঙ্গ কর। সুদক্ষ নাবিক যেমন অরিত্রযুক্ত দৃঢ় নৌকায় করিয়া বহু ব্যক্তিকে তাহার পরিজ্ঞাত পথ দিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে, জ্ঞানবান্ সাধু ব্যক্তিও তেমনি তোমাকে অনায়াসে তাঁহার সুবিদিত ধর্ম্ম ও কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিতে পারিবেন।

চিত্তের সন্তোষ, শীলপালন ও ইন্দ্রিয়সংযম তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও।

শীলপালনের দ্বারা তোমার বুদ্ধিচাঞ্চল্য দূর হইলেই তুমি সুখানুভব করিবে এবং তোমার দুঃখ দূর হইবে। ফুলের গাছে নূতন ফুল ফুটিলে যেমন ম্লান ফুলগুলি আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়ে, তেমনি তোমার চিত্ত পুণ্যে পবিত্রতায় মণ্ডিত হইলেই

কামাভিলাষ আপনি দূরীভূত হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক শীলপালন করিয়া তুমি তোমার মন আপন বশে আনয়ন কর, তাহা হইলেই পরমানন্দে বিচরণ করিতে পারিবে। আষ্টাঙ্গিক পথকে সকল পথের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং চারি আর্য্য সত্যকে সকল সত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। প্রসন্নচিত্তে এই অনুশাসনগুলি প্রতিপালন কর এবং মৈত্রীময় চিত্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত কর, তাহা হইলে অচিরেই তুমি সুখকর নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।

বৌদ্ধনীতি

যে সাধক শ্রেয়কে লাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে অনলস হইয়া অন্তরে বাহিরে শুচি হইতে হইবে। এই শুচিতালাভ সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কথা। ইহারই জন্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পালন, ইহারই জন্য শীলগ্রহণ। অধ্যাত্মদৃষ্টি প্রস্ফুটিত না হইলে সত্যের সাক্ষাৎকার হয় না। এইজন্যই সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে নির্ম্মল করেন। তিনি জানেন, যখনি তাঁহার মন স্বচ্ছ ও স্থির হইবে, তখনি সেখানে সত্য প্রতিবিম্বিত হইবে।

কূর্ম্ম যেমন অনায়াসে নিজ শুণ্ড প্রত্যাহরণ করিয়া থাকে, সাধক তেমনি অভ্যাসের দ্বারা নিজের মনকে সর্ব্বপ্রকার কলুষ হইতে প্রত্যাহৃত করিতে যত্নশীল হন। মন যাহার বশীভূত হয় নাই, তাহার ধ্যান নাই, উপাসনা নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই। মনের গুপ্ত স্থানে যে সমুদয় পাপাভিলাষ জমিয়া থাকে, সেগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির মনকেও ব্যাকুল করিয়া দেয়। সুতরাং পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিলেই আমরা ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব এ কথা সত্য নহে। অথবা বাহিরের ব্যবহারে ভাল মানুষ হইলেও সাধনার জীবনে আমরা অগ্রসর হওয়ার আশা করিতে পারি না।

এইজন্যই ধর্ম্মপদে উক্ত হইয়াছে—

আকাসে চ পদং নত্থি সমণো নত্থি বাহিরে।

আকাশে যেমন পথ নাই, তেমনি বাহ্যকর্ম্মের দ্বারা মনুষ্য শ্রমণ অর্থাৎ সাধু হয় না। বাহির হইতে হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া, যদি আমরা মনে মনে পাপানুধ্যানে নিরত থাকি, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া সত্যলাভের আশা করিতে পারি? সত্য বল, ধর্ম্ম বল সকলি মনের ব্যাপার। ধম্মপদে উক্ত হইয়াছে,—ধম্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়। আমাদের বাক্যকে, আমাদের কার্য্যকে মনের নির্ম্মলতা দ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে।

মনসা চে পসন্নেন ভাসিত বা করোতি বা।

ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী॥

যদি কেহ নির্ম্মলান্তঃকরণে কথা কহেন কিংবা কার্য্য করেন, তবে সুখ তাঁহাকে সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।

আবার অন্য পক্ষে বলা হইয়াছে—

মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসিত বা করোতি বা।

ততো নং দুক্‌খমমন্বেতি চক্কং চ বহতো পদং॥

যদি কেহ দূষিত মনে কথা কহে বা কার্য্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দুঃখও তাহাকে সেই রূপ অনুসরণ করে।

যিনি সুখার্থী, যিনি ধর্ম্মার্থী, তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক, নিজের মনকে স্ববশে আনিতে হইবে এবং মনটিকে সর্ব্ববিধ

মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্বী করিতে হইবে। এইজন্যই ভগবান্ বুদ্ধ বিশ্বাসীদিগকে শীল গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধনায় শীলই নির্ব্বাণের পাথেয়। শীলগুলি চরিত্রকে বলিষ্ঠ করে এবং চরিত্রকে গড়িয়া তোলে। সুতরাং সাধনার পথে অগ্রসর হইবার সম্বলই শীল। "সুখং যাব জরা সীলং"—বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত শীলপালন সুখকর।

বৌদ্ধশীলগুলি আলোচনা করিলে, আমরা এইগুলির মধ্যে বুদ্ধের একটি আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাই। নীতিশাস্ত্রের যে দিকটা মানুষের বাহ্য আচারব্যবহার নিয়মিত করে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত শীলগুলি সে দিকটা উপেক্ষা করে নাই, অথচ নীতিশাস্ত্রের যে দিকটা মানবের মনকে কল্যাণের পথে লইয়া যায়, সেই দিকটার উপর তিনি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইহলোক ও পরলোকের সুখকামনায় যাগযজ্ঞবাহ্যক্রিয়া-কলাপকে বুদ্ধ সুদৃঢ়কণ্ঠে একান্ত নিস্ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়বিজয় ও চরিত্রসংশোধন করিয়া, দয়াদাক্ষিণ্যমৈত্রীমূলক কল্যাণব্রত সাধনকেই তিনি শ্রেয়োলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুপরিচালিত চিত্ত দ্বারাই আমরা শ্রেয়োলাভের আশা করিতে পারি, বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা নহে। এইজন্যই বুদ্ধ বলিয়াছেন ঃ—

ন তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্ঞে বাপি চ ঞাতকা।
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো তং ততো করে॥

সম্যক্‌পরিচালিত চিত্ত মানুষের যেরূপ শ্রেয়ঃ করিয়া থাকে, মাতাপিত কিংবা অন্য কোনো আত্মীয় তেমন পারে না।

বৌদ্ধনীতি বিশ্বাসীর আচরণ, কার্য্য ও ভাবনা এই তিনকেই সুখকর ও কল্যাণকর করিয়া তোলে। সাধু বৌদ্ধ কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনে আপনাকে তিনি নিরন্তর নিযুক্ত রাখিবেন। সাধু বৌদ্ধ আপনার চিত্তকে কদাচ অনাবৃত রাখিবেন না, মঙ্গল ভাবনা দ্বারা তিনি তাহার চিত্তকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবেন।

বুদ্ধ বলেন—

যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্‌ঝতি।
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতি বিজ্‌ঝতি॥

যেমন সুন্দররূপে আচ্ছাদিত গৃহ ভেদ করিয়া বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ সুভাবিত চিত্ত ভেদ করিয়া পাপাসক্তি প্রবেশ করিতে পারে না।

বৌদ্ধনীতি মানবকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিয়া কল্যাণের পথে আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মানবকে অতন্দ্রিত হইয়া পুণ্যকর্ম্ম সাধন করিতে বলিতেছে।

বুদ্ধ বলিতেছেন ঃ—

অভিত্থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করাতো পুঞ্‌ঞং পাপস্মিং রমতী মনো॥

কল্যাণলাভের জন্য তোমরা অতি ত্বরায় ধাবমান হও, পাপ হইতে

মনকে নিবৃত্ত কর। আলস্যের সহিত পুণ্যকর্ম্ম করিলে মন পাপে রত হইয়া থাকে।

বুদ্ধ বাহ্য অনুষ্ঠানক্রিয়াকলাপের উপকারিতায় বিশ্বাস করিতেন না; প্রাণহীন, শ্রদ্ধাহীন পুণ্যকার্য্যও তেমনি তিনি অকল্যাণকর মনে করিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অনুরাগের সহিত পুণ্যকার্য্য না করি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেগুলি আমাদের নিকট সুখকর ও কল্যাণকর হয় না। এইজন্য পুণ্যকর্ম্ম পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিতে হয়। তাহা হইতেই ঐ পুণ্যানুষ্ঠান-গুলির প্রতি আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা জন্মিয়া থাকে।

বুদ্ধ বলিতেছেন—

> পুঞ্‌ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা কয়িরাথেনং পুনপ্পুনং।
> তম্‌হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পুঞ্‌ঞস্‌স উচ্চয়ো ॥

যদি কোন ব্যক্তি পুণ্যকর্ম্ম করে, তাহা হইলে সে যেন ইহা পুনঃ পুনঃ করে—যেন ইহাতে তাহার অনুরাগ জন্মায়; কারণ পুণ্য-সঞ্চয় সুখকর।

পুণ্যানুষ্ঠানকে আমাদের সহজ করিয়া ফেলিতে হইবে। কর্ত্তব্যবোধে নয়, অন্যের অনুরোধে নয়, নিজের মনের আনন্দে আমাদিগকে পুণ্য আচরণ করিতে হইবে। পাখী যেমন মনের আনন্দে গান গায়, ফুল যেমন সহজে ফুটিয়া উঠে, তেমনি আনন্দে, তেমনি সহজে আমরা আপনাদিগকে কল্যাণব্রতে নিয়োজিত

করিব। অভ্যাসদ্বারা পুণ্যানুষ্ঠানগুলি যখন এমন অনায়াস হয়, তখনই সেগুলি মঙ্গল হইয়া উঠে।

বুদ্ধ বলেন ঃ—

ভদ্রো পি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি ॥

যাবৎ পুণ্যকর্ম্ম পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ সাধু ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্মের মধ্যেও অশুভ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যখনি পুণ্যকর্ম্ম পরিপক্ক হয়, তখনি তিনি মঙ্গল দর্শন করেন। পরিপক্ক বস্তু যেমন আমাদের রক্তমাংসে পরিণত হইয়া আমাদেরই অঙ্গীভূত হয়, অভ্যাস দ্বারা পুণ্যাচরণকে তেমনি আমাদের মনের সহজ বিষয় করিয়া ফেলিতে হইবে। মন যখন এইরূপ স্বাভাবিক পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত হইবে, তখনই আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠান মঙ্গল হইয়া উঠিবে।

বাস্তবতার দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের ঝোঁক থাকিলেও নীতির ক্ষেত্রে এই ধর্ম্ম ভাবকে অতি উচ্চ আসন দিয়াছে। বৌদ্ধনীতি জোরের সহিত এই কথাই প্রচার করিয়া থাকে যে, তুমি যাহা বল, তুমি যাহা কর, সমস্তই মন হইতে বলিবে মন হইতে করিবে। মন হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন বলিয়া মন হইতেই তোমাকে হইয়া উঠিতে হইবে। তুমি যে শীল গ্রহণ করিবে তাহা স্বেচ্ছায়-প্রবৃত্ত শীল হইবে, সে সমুদায় কতগুলি বিধির অচলগণ্ডী হইয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিলে চলিবে না। তুমি যে শীলকে স্বীকার করিবে

তাহা স্বাধীন শীল হইবে। লোকযশঃ কিংবা অর্থলাভের জন্য তোমার শীল আচরিত হইবে না। তুমি যে মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা বিমূঢ়ের অভ্যস্ত আচার হইলে চলিবে না, তাহা সম্যগ্‌জ্ঞানপূর্ব্বক আচরিত হইবে।

বুদ্ধ বলেন—

অত্তদত্থমভিঞ্ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া।

নিজের মঙ্গলকর কার্য্য সম্যগ্‌রূপে জানিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। ভিতর হইতে মানুষ ভাল না হইলে, সে ভাল হওয়ায় কোনো ফল নাই বলিয়া বুদ্ধ বলিয়াছেন—তোমরা মনের ক্রোধ ত্যাগ করিবে, মনকে সংযত করিবে, মনের দুষ্ট আচরণ ত্যাগ করিয়া মনের দ্বারা সৎকর্ম্ম সাধন করিবে। তিনি তাঁহাকেই যথার্থ সুসংযত বলেন, যাঁহার দেহ, বাক্য এবং মন এই তিনই সুসংযত। তিনি বলেন, প্রেম দ্বারা ক্রোধ, মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গল, নিঃস্বার্থতা দ্বারা স্বার্থ এবং সত্য দ্বারা মিথ্যা জয় কর। যে অপকার করে তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া প্রেম দান কর। যে যত অপকার করে, তাহার তত উপকার কর। সংগ্রামে যে লক্ষ লোককে জয় করে সে প্রকৃত বিজয়ী নহে, যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই প্রকৃত বিজয়ী। যে তোমার শত্রু সে তোমার কি অপকার করিতে পারে? তোমার গুরুতর অনিষ্ট করে তোমারই বিপথগামী মন সুতরাং তোমার চঞ্চল মন যাহা সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহাকে সংযত কর, বহু

কল্যাণ হইবে। সংযত মনই সুখ আনয়ন করে। পাপ ও পুণ্য সমস্তই তোমার নিজকৃত। অন্য কেহ তোমাকে পবিত্র করিতে পারিবে না।

বুদ্ধ বলেন, মনকে নিষ্কলুষ করিতে হইলে (১) প্রাণীহত্যা করিও না (২) যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই, তাহা তুমি গ্রহণ করিও না (৩) ব্যভিচার করিও না (৪) মিথ্যা কহিও না (৫) সুরাপান করিও না; এবং (১) তোমার দৃষ্টি সাধু কর (২) তোমার সঙ্কল্প সাধু কর (৩) তোমার বাক্য সাধু কর (৪) তোমার ব্যবহার সাধু কর (৫) তোমার জীবিকা অর্জন সাধু কর (৬) তোমার সর্ব্বচেষ্টা সাধু কর (৭) তোমার চিন্তা সাধু কর (৮) সাধুধ্যানে তোমার চিত্ত সমাহিত কর।

নির্ব্বাণপথের যাত্রীকে বুদ্ধ বলিতেছেন—

(১) তুমি যে পুণ্য লাভ করিয়াছ তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা কর।

(২) নব নব পুণ্যলাভের চেষ্টা কর।

(৩) পূর্ব্বের সঞ্চিত পাপ অবিলম্বে ত্যাগ কর।

(৪) নূতন পাপ তোমাকে আক্রমণ না করে, তজ্জন্য সতর্ক হও।

উপরিউক্ত প্রথম পাঁচটি নৈতিক নিষেধকে আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধগণ "পঞ্চশীল" বলেন। তাহারা "পঞ্চশীল," "অষ্টশীল" বা "দশশীল" গ্রহণ করিয়া থাকেন। শীলকে তাঁহারা নির্ব্বাণ-

লাভের পাথেয় বলিয়া জানেন। তাঁহারা শীলপালন দ্বারা কল্যাণলাভ করেন বলিয়া শীলকে "মহামঙ্গল," "কুশল" প্রভৃতি নাম দিয়াছেন।

মানুষেব হৃদয়ে যে পাপ, যে চঞ্চলতা জমিয়া উঠিয়া তাহাকে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে, বুদ্ধ মানব মনেব সেই মলিনতাকে "অবিদ্যা" নাম দিয়াছেন। সকল মলিনতা হইতে এই অবিদ্যাকে তিনি নিকৃষ্টতম মলিনতা বলিয়াছেন।

তেতো মলা মলতবং অবিজ্জা পরমং মলং।
এতং মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্‌খবো॥

অপর মলিনতা অপেক্ষা অধিকতর মলিনতা আছে; অবিদ্যাই সেই মলিনতা। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা সেই মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হও। এই মলিনতা বা অবিদ্যাকে বিনাশ করিতে পারিলেই মানুষের মন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হয় এবং তখনই মানব সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হয়।

উত্তবকালে মহাপুরুষ যিশুও ঠিক ঐ কথাটি ঘোষণা করিয়াছেন—"Blessed are the pure in heart for they shall see God"—অর্থাৎ নির্ম্মল-হৃদয় ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাঁহারাই ঈশ্বরের দেখা পাইবেন।

বৌদ্ধ গৃহ ও গৃহী

ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন—হে গৃহী, তুমি তোমার গৃহকে মঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত কর, তোমার গৃহের সর্ব্বদিক মঙ্গল দ্বারা সুরক্ষিত কর; প্রাণহীন বাহ্য ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ইহা রক্ষিত হইতে পারে না।

হে গৃহী, পিতামাতার সেবা কর, তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা কর, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য হও, তাঁহারা পরলোকে গমন করিয়া থাকিলে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে স্মরণ কর, তাহা হইলেই তোমার গৃহের একদিক সুরক্ষিত হইবে। যিনি তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিলেন, সেই গুরুকে দেখিবামাত্র দণ্ডায়মান হইও, তাঁহার সেবা করিও, আদেশ পালন করিও, তাঁহার অভাব মোচন করিও এবং তিনি যে উপদেশ দান করিবেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিও; তাহা হইলে তোমার গৃহের অন্য একটি দিক মঙ্গলে রক্ষিত হইবে। যিনি তোমার সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহভোগিনী সেই স্ত্রীকে সম্মান দেখাইও, তাঁহার সহিত কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, তিনি যাহাতে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন তাহার চেষ্টা করিও, তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার দান করিও এবং তোমার আত্মজ পুত্র কন্যাদিগকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখিও। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দিও, তাহাদিগকে আপন সম্পত্তির উপযুক্ত

উত্তরাধিকারী করিও ; তাহা হইলে তোমার গৃহের অপর একটি দিক মঙ্গল দ্বারা সুরক্ষিত হইবে। যাঁহারা তোমার হিতৈষী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু, তাহাদের সহিত সদালাপ করিও, তাঁহাদিগকে উপহার দিও, তাঁহাদের হিতসাধন করিও, তাঁহাদিগকে আপনার তুল্য জ্ঞান করিও, নিজের ধনসম্পদের একাংশ তাঁহাদিগকে দান করিও, তাঁহাদিগকে বিপথগামী হইতে দিও না, দরিদ্র হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিও, তাঁহাদের পরিজনগণের সহিত সদয় ব্যবহার করিও, তাহা হইলে তোমার গৃহের আর একটি দিক মঙ্গলে রক্ষিত হইবে। পরার্থে যাঁহারা আপনাদিগকে উৎসর্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহাদের কল্যাণকামনা নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বজীবের প্রতি বর্ষিত হইতেছে, সেই সাধুসজ্জনদিগকে তুমি কায়মনোবাক্যে সেবা করিও, তাঁহাদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিও, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বগৃহে অতিথিরূপে বরণ করিয়া লইও ; তাহা হইলে তোমার গৃহের আর একটি দিক মহামঙ্গলের প্রভায় রক্ষিত হইবে। দেহের দ্বারা, মনের দ্বারা যাহারা তোমার সেবা করে, তোমার সন্তোষবিধানের জন্য যাহারা সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছে, তুমি সেই দাসদাসীদিগকে কর্ম্ম ভাগ করিয়া দিও ; অন্ন দিয়া, বেতন দিয়া, পারিতোষিক দিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও ; আপনি যে সুস্বাদু দ্রব্য আহার কর তাহার অংশ তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিও, মাঝে মাঝে তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া সন্তুষ্ট রাখিও এবং তাহারা রুগ্ন

হইলে তাহাদিগকে ঔষধ পথ্য দান করিও; তাহা হইলে তোমার গৃহের অপর একটি দিক মঙ্গলমণ্ডিত হইয়া সুরক্ষিত হইবে।

বুদ্ধ কহিলেন,—হে গৃহী, যিনি ধর্ম্মকে ভাল বাসিবেন, তিনিই বিজয়ী হইবেন, যিনি ধর্ম্মকে ঘৃণা করিবেন, তিনিই পরাভূত হইবেন। দুর্জ্জন যাহার প্রিয়, যে ব্যক্তি সাধুজনের আচরণ বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জনের অনুসরণ করে, তাহার পরাভব সুনিশ্চিত। জনস্রোতের সঙ্গে যে জন আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া তন্দ্রিতভাবে উদ্যমহীন, বীর্য্যহীন জীবন যাপন করে এবং যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতেই হয়। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের অধিবাসী হইয়াও বৃদ্ধ জনকজননীর ভরণ পোষণ করে না তাহার পরাভব অবশ্যম্ভাবী। সাধুসজ্জনকে যে ব্যক্তি মিথ্যা দ্বারা প্রতারিত করে, তাহাকেই পরাভূত হইতে হয়। যে আত্মম্ভরি ব্যক্তি অশেষ ধনধান্যের অধিকারী হইয়াও সমস্ত সুখসেব্য পদার্থ একাকী ভোগ করে, তাহার পরাভব নিশ্চিত। ধনের গর্ব্বে, কুলের অভিমানে এবং বংশের গৌরবে যে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া আত্মীয়দিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে, তাহারি পরাভব ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ব্যভিচারে, মদ্যপানে এবং অক্ষক্রীড়ায় প্রমত্ত, সে পরাভূত হইবেই। তাহারই পরাভব হইবে, যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মপত্নীর প্রতি বিরক্ত অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত। যে আপনার অল্প সম্পত্তিতে অতৃপ্ত হইয়া

সাম্রাজ্যের অধিকার কামনা করে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতেই হয়।

গৃহের সর্ব্বদিক যেমন মঙ্গলের দ্বারা সুরক্ষিত করিবার জন্য বুদ্ধ গৃহীকে আদেশ করিলেন, তেমনি তিনি তাহাকে আপনার অন্তর বাহির উভয়দিক পুণ্যপবিত্রতার মঙ্গলবর্ম্মে আচ্ছাদিত করিতে উপদেশ দান করিয়াছেন। তিনি গৃহীকে কহিলেন—হে গৃহী, তোমাকে যখন গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, তুমি কোনোক্রমে ভিক্ষুর ব্রত সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারিবে না, তুমি যাহাতে সাধু গৃহস্থ হইতে পার, আমি তাহার জন্য তোমাকে নিম্নলিখিত ব্রত গ্রহণ করিতে বলিতেছি—

তুমি কদাচ জীবহত্যা করিও না, করাইও না কিংবা অপরের জীবহত্যার অনুমোদন করিও না। সবল, দুর্ব্বল সর্ব্বপ্রাণীর হিংসা হইতে বিরত হও। যাহা তোমাকে দেওয়া হয় নাই, তাহা স্বয়ং কিংবা অন্যের সহায়তায় অপহরণ করিও না। সর্ব্বপ্রকার চৌর্য্য হইতে বিরত হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের অসংযম জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য জ্ঞান করিয়া বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যদি তুমি তোমার প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ জয়ী হইতে অসমর্থ হও, তাহা হইলেও কদাচ ব্যভিচার করিও না। তুমি মিথ্যা কহিও না, সর্ব্ববিধ মিথ্যার সংশ্রব হইতে মুক্ত থাকিবে। সদ্ধর্ম্মের প্রতি তোমার যদি কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে সুরাপান করিও না। সুরাপানে

উন্মত্ত হইয়া নির্ব্বোধেরা নানা পাপাচরণ করিয়া থাকে, অন্যকে ইহা পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তোলে ; পাপের বাসভূমি এই স্থরাপান এবং তজ্জনিত প্রমত্ততা অসজ্জনেরই প্রিয়, তুমি ইহা পরিবর্জ্জন কর। তুমি মাল্য ধারণ, স্থগন্ধদ্রব্য ব্যবহার এবং স্থকোমল শয্যায় শয়ন করিও না।

বুদ্ধ কহিলেন,—হে গৃহী, পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, তুমি বৃদ্ধকে সম্মান করিও, কদাচ পরশ্রী-কাতর হইও না ; ধর্ম্মে তোমার আহ্লাদ হউক, ধর্ম্মে তোমার প্রীতি হউক, ধর্ম্মজ্ঞান-লাভের জন্য তোমার পিপাসা হউক, ধর্ম্মেই তুমি স্থিত হও, ধর্ম্মের প্রতিকূলে কোন বিতণ্ডা তু িও না, তাহাতে ধর্ম্মে কলঙ্কস্পর্শ করিতে পারে, এমন কোনো আচরণ কখনো করিও না। অসত্যভাষণ ত্যাগ করিয়া শোভন বাক্যালাপে দিনযাপন করিও। যিনি তোমার গুরু, যথাকালে তাঁহার সমীপে গমন করিও। সর্ব্বপ্রকার ধৃষ্টতা ত্যাগ করিয়া তোমার শ্রদ্ধাবনত চিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিও। যাহা মঙ্গল তাহা করিও এবং তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া অভ্যাস করিয়া লইও। তুমি ভণ্ডতা, রূক্ষতা, লোভ, মোহ, অহঙ্কারাদি বর্জ্জন করিয়া দৃঢ়চিত্তে প্রসন্নভাবে দিন যাপন কর। সদ্ধর্ম্মে তোমার চিত্ত যদি নন্দিত হয়, তাহা হইলেই তুমি শান্তি, প্রেম ও ধ্যানের মধ্যেই অবস্থান করিতে পারিবে।

বৌদ্ধজীবন

দুঃখের অস্তিত্ব একটি মহাসত্য * মানবজীবনের অপরি-হার্য্য অ-স্ত দুঃখ যখন সিদ্ধার্থের প্রজ্ঞাগোচর হইল, তখন তিনি ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভিক্ষুব্রত গ্রহণ কবেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, সাধারণ মানবকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। একটি দুঃখের অবসান হইতে না হইতেই দ্বিতীয় একটি দুঃখের উত্থান হইতেছে। উত্তাল তরঙ্গমালার তুল্য দুঃখপরম্পরা একটির পর আর একটি মানবকে আক্রমণ করিতেছে; তাহার সংগ্রামের বিরতি নাই।

সিদ্ধার্থের মনে প্রশ্ন উত্থিত হইল, এই দুঃখের মূলীভূত কারণ কি? মানব কি আত্মশক্তি দ্বারা এই দুঃখরাশি নিঃশেষে নিরাকরণ করিতে পারে না? কি উপায় অবলম্বন করিলে এই দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে?

সাধারণ মানব আপন ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আপনি অবগত নহে; ঐহিক জীবনযাত্রার শেষে সে যে কোন্ পরিণামে উত্তীর্ণ হইবে তাহা কখনো তাহার কল্পনায়ই উদিত হয় না। তাহার প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক চিন্তা কোন্ পবিণামের সৃষ্টি করিতেছে, সে তাহা অবগত নহে।

---

* দুঃখ দুঃখের উদ্ভব, দুঃখের নিবৃত্তি এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায় এই চারিটি বৌদ্ধশাস্ত্রে চতুরার্য্যসত্য নামে উক্ত হইয়া থাকে।

তাহার বর্ত্তমান ব্যক্তিত্ব কেমন করিয়া সম্ভব হইল, সেই রহস্য সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনাকে আপনি না জানিয়া মানব আপনার সত্তা রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরন্তব সংগ্রাম করিতেছে। অন্ধ যেমন আপনার গন্তব্য পথ দেখিতে পায় না, তথাপি দণ্ডহস্তে কোনরূপে যাতায়াত করে, মানবও তদ্রূপ অন্ধভাবে জীবনপথে চলিতে থাকে। সত্তা রক্ষা করিবার জন্য এই সংগ্রামে মানব যেমন অশেষ দুঃখ পাইয়া থাকে, তেমনি স্থূল সুখও লাভ করিয়া থাকে। জীবন এই সুখদুঃখের সংমিশ্রণ। শশিকলায় যেমন হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে, তরঙ্গে যেমন উত্থান ও পতন আছে, জীবনে তেমনি সুখ ও দুঃখ রহিয়াছে।

দুঃখের অস্তিত্বসম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। সমগ্র বিশ্বজীবন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানব যখন আপনার ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট সত্তা রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করে, তখন তাহাকে দুঃখভোগ করিতেই হয়। সমগ্র জগতে সংযোগবিয়োগের যে অমোঘ বিধান বিদ্যমান আছে, দেবমানব কেহই সেই বিধান অতিক্রম করিতে পারিবেন না। যে শক্তি-সমূহের সমবায়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তার উদ্ভব হইল, একদিন-না-এক দিন সেই শক্তি পুঞ্জ বিশ্লিস্ট হইয়া পড়িবেই। যে মুহূর্ত্তে একটি সত্তার সৃষ্টি হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার উপর জরাব্যাধি-মৃত্যুর ক্রিয়া আরম্ভ হইল। মানবের সত্তা সীমার দ্বারা আবদ্ধ; যেখানে সীমা, সেইখানেই অবিদ্যা; যেখানে অবিদ্যা, সেইখানেই দুঃখ।

মানব যখন একটি স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে তখন তাহার মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ছয়টি মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; ইহারই ফলে মানবের মনে বেদনার সঞ্চার হয় এবং ঐ বেদনা নানা তৃষ্ণার আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। মানব তাহার এই তৃষ্ণার দাবী কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারে না;—মন প্রিয় বলিয়া যাহা চায় তাহা সকল সময়ে পায় না এবং অপ্রিয় বলিয়া যাহা বর্জ্জন করিতে চায়, তাহাও সময়ে সময়ে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

তৃষ্ণার রসদ যোগাইতে এই অসমর্থতাই মানবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ। যে মানব আপনাকে আপনি সম্যগ্‌ জ্ঞাত নহে, তাহার তৃষ্ণা লতার ন্যায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মেঘবর্ষণে তৃণরাজি যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, তৃষ্ণাভিভূত ব্যক্তির দুঃখও তেমনি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জালবদ্ধ শশকের ন্যায় তৃষ্ণাপরিবৃত ব্যক্তি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় এই দশপ্রকার শৃঙ্খলে সংযুক্ত থাকিয়া বারংবার দুঃখ পাইয়া থাকে।

অবিদ্যাবশে মানব আপনাকে বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে এই অনন্ত বিশ্বরূপ মহাসাগরের একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। স্বভাবতঃই তাহার মনে হয়, যেন সে ভূত কালের, বর্ত্তমান কালের ও ভবিষ্যৎকালের চেতন অচেতন সকল

পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই সে তাহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের প্রীতিসাধনের জন্য নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকে; অথচ সংগ্রামের ফলে তুচ্ছ সুখোপকরণ লাভ করিয়া তাহার তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়; এই প্রকারে সে বৃহত্তর দুঃখ এবং উগ্রতর নৈরাশ্যের সম্মুখীন হইতে থাকে।

ক্ষিপ্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া সমতল ভূমির উপর দিয়া সারথি শকটারোহণে অগ্রসর হইতে হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাহার প্রচণ্ড গতি অনুভব করিতেছে; বলদর্পিত অশ্বও পদপীড়িত পৃথিবী হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিতেছে; কিন্তু অত্যুচ্চ প্রাচীরের উপরে দণ্ডায়মান এক প্রহরী ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না, সে দেখিতেছে একটি অখণ্ড পদার্থ পৃথিবীর উপরে নড়িতেছে; বায়ুবেগে আন্দোলিত কেশর যেমন অশ্বেরই দেহাংশমাত্র, উক্ত অখণ্ড পদার্থটি তদ্রূপ ধরণীরই অংশমাত্র। তেমনি যিনি জ্ঞানের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন, তিনিই পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

মানব যতদিন আপনার প্রীতিকামনায় তুচ্ছ সুখভোগের অন্বেষণ করিবে এবং আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে ফাঁপাইয়া-ফুলাইয়া তুলিবে, ততদিন সে কোনোক্রমে দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে না। আর যখন তাহার রাগদ্বেষাদি থাকিবে না, চিত্ত শান্ত হইবে, তখনই ধর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া অলৌকিক আনন্দ লাভ করিবে।

মহাপুরুষ বুদ্ধের জীবন মানবকে এই কথাই বলিতেছে—হে মানব, যে ক্ষুদ্র অহংবুদ্ধি তোমাকে বিশ্ব হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে, ঐ ভেদবুদ্ধি তোমার প্রার্থনীয় নহে ; বুদ্ধি স্থির করিয়া তুমি শীল গ্রহণ কর ; মঙ্গলব্রতসাধনের বিমল আনন্দলাভ করিলে ক্রমশঃ তোমার সকল দুঃখের ধ্বংস হইবে। পুষ্পিত তরুর ন্যায় তুমি রাগদ্বেষাদি ম্লান কুসুমগুলি ত্যাগ কর। বোধকে জাগরিত করিয়া তুমি আপনাকে প্রসারিত করিলেই সকল হীনতার, সকল ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠিয়া দেশকালের অতীত বিশ্বের সহিত ঐক্য অনুভব করিবে। এই ঐক্যানুভূতিই তোমার প্রার্থনীয়। এই বোধই সকল সত্যের সার। সঙ্কুচিত হইও না, নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে থাক, তুমি কল্যাণকর নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।

হে মানব, সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া তুমি সার সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, ঐ সত্যের বীজ তোমারি অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। তোমার ক্ষুদ্র সত্তানুভূতি কি কখনো তোমাকে বিমল আনন্দ দান করিয়াছে ? তুমি কোন্ বস্তুর জন্য সংগ্রাম করিতেছ ? স্বাস্থ্য, সম্পদ্, সুখ, শান্তি, সাফল্য, খ্যাতি হয়ত তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয় হইবে ; কিন্তু ইহারা কি তোমকে শাশ্বত আনন্দ দান করিতে পারে ? জরা ও ব্যাধি তোমার স্বাস্থ্যের বিনাশসাধনের জন্য প্রত্যহ যুদ্ধ করিতেছে ; যাবৎ তুমি চিত্তে শান্তিলাভ করিতে না পারিবে তাবৎ সম্পদ্, ভোগ, সুখ, শক্তি, সাফল্য, খ্যাতি কিছুতেই তোমাকে বিমল আনন্দ দান করিতে পারিবে না।

ক্ষুদ্র সুখভোগের বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া তুমি যখন সত্যের বিমল জ্যোতির সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, তখন দেখিতে পাইবে তুমি যে কল্যাণ লাভ করিয়াছ তাহা কত গভীর, কত পরিপূর্ণ কেমন অনন্তপ্রসারী।

হে নির্ব্বাণকামী মানব, তোমার চিত্ত-অশ্বকে সংযত করিতেই হইবে, তৃষ্ণার মূল উৎপাটন করিতেই হইবে। নচেৎ নদীর স্রোত যেমন কুলজাত নলকে পুনঃ পুনঃ বক্র করিয়া থাকে, কামলালসা তেমনি তোমাকে বারংবার আক্রমণ করিয়া পীড়িত করিবে। মূল অচ্ছিন্ন থাকিলে বৃক্ষ যেমন পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয়, তেমনি তৃষ্ণার মূল উৎপাটিত না হইলে দুঃখ পুনঃ পুনঃ আসিবেই। তুমি ঊর্ণনাভের ন্যায় ক্ষুদ্র জাল রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, মণ্ডূকের ন্যায় কূপকেই সর্ব্বস্ব মনে করিতেছ; একবার কূপ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিলেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষগোচর হইবে। তুমি ওঠ, জাগরিত হও; স্বার্থত্যাগ করিয়া পরার্থে জাগরিত হও; ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া বিরাটকে গ্রহণ কর; আপনার মধ্যে ক্ষুদ্র সত্তাকে অন্বেষণ না করিয়া সর্ব্বজীবের ও সর্ব্বভূতের মধ্যে আপনার বৃহৎ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর।

হে ধর্ম্মপথের যাত্রী, তুমি তোমার প্রীতিকে বাধাহীন, সীমাহীন করিয়া সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে প্রসারিত কর। তুমি ইহ জীবনেই আপনার বিরাট্‌সত্তা অনুভব করিতে পার, ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ

গৌরব ; তুমি স্বয়ং আপনার প্রদীপস্বরূপ হইয়া, আত্মশক্তি-দ্বারা চরম কল্যাণ লাভ করিতে পার, ইহাই তোমার পরম গৌরব। যে দিন বিমল বোধি লাভ করিয়া তুমি ধন্য হইবে সে দিন তোমার স্বার্থ বিশ্বজনের স্বার্থ হইবে, সে দিন তোমার কল্যাণ বিশ্ববাসীর কল্যাণ হইবে।

ইহ জীবনেই আপনার বিরাট্‌সত্তা অনুভব করিয়া নির্ব্বাণামৃত লাভ সম্ভবপর বলিয়া বৌদ্ধসাধু জীবনকে অতি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন। সুখ, দুঃখ, আনন্দ এমন কি মৃত্যুপর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বভূতের মঙ্গলসাধনে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকেন ; কারণ তিনি অনুভব করিয়া থাকেন যে, তিনি বিচ্ছিন্ন নহেন, সমস্তের সহিত নিগূঢ় যোগে সংযুক্ত এবং সর্ব্বভূতের মঙ্গলই তাঁহার মঙ্গল। আপনার ক্ষুদ্রসত্তার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন এবং বিরাট্‌সত্তার মধ্যে অবস্থানই বৌদ্ধজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।
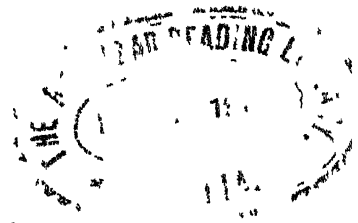
বৌদ্ধকর্ম্ম

এইরূপ কথিত আছে, বিমল বোধিলাভ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছিলেন—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং ॥
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝ গা।

গৃহকারকের সন্ধান করিয়া তাহাকে না পাইয়া কতবার জন্ম গ্রহণ করিলাম, কত সংসার পরিভ্রমণ করিলাম, পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিয়া কি দুঃখই পাইলাম। হে গৃহকারক, এবার তোমার দেখা পাইয়াছি, এবার আর গৃহরচনা করিতে পারিবে না, তোমার সকল স্তম্ভ ও গৃহভিত্তি ভগ্ন হইয়াছে, আমার বিগতসংস্কার চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বাণীটির মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, একই গৃহকারক জীবের জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া স্রোতোরূপে প্রবহমাণ এবং এই গৃহকারক মানবের মহাবোধির প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেই গৃহের সাজসরঞ্জাম্ চূর-মার হয় এবং গৃহকারকের সকল ক্ষমতা পরাহত হইয়া যায়। গৃহকারকের প্রতিষ্ঠাভূমি সংস্কার ও

তৃষ্ণা; কারণ সংস্কারের ও তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে তাহার আর পাদক্ষেপের স্থান পর্য্যন্ত থাকে না।

অভিধর্ম্ম এই গৃহকারের নাম দিয়াছেন কর্ম্ম। বাহিরের ক্রিয়াগুলি বা ব্যাপারগুলি কর্ম্ম নহে। আমি শত্রুকে বধ করিলাম, এই হননব্যাপার কর্ম্ম নহে, ইহা সাধন করিয়া যে সংস্কারের উৎপত্তি হইল, তাহাই কর্ম্ম বা উক্ত সংস্কারের অন্তর্নিহিত গূঢ়-শক্তি কর্ম্ম। রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান ইহাদের মধ্যে যে শক্তি অবস্থান করিয়া ইহাদিগকে বুনিয়া অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের জাল রচনা করে, কর্ম্ম সেই শক্তি। বৌদ্ধেরা এই ব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সূর্য্যরশ্মি ও বৃষ্টির কণা যেমন মনোমোহন ইন্দ্রধনু রচনা করে, সেইরূপ রূপবেদনাদি স্কন্ধই আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করিয়া থাকে, বস্তুতঃ ব্যক্তিত্বের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। দুই স্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী বায়ুপ্রবাহ ঐ দুই স্থানের চাপের তারতম্য দূর হইবামাত্র যেমন বিশ্ববায়ুর সহিত মিলিয়া যায়, আমাদের ব্যক্তিত্বও বাসনার বিলোপ ঘটিবামাত্র তেমনি বিশ্বসত্তার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

ব্যক্তিত্বের বা অহংএর পরমার্থতঃ কোন অস্তিত্ব নাই। রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধের হেতুই ব্যক্তি। ইহার অস্তিত্বের প্রকৃতি যেমনই হউক, এই ব্যক্তিই দুঃখ ভোগ করেন, সংসারে বিচরণ করেন এবং এই ব্যক্তিরই নির্ব্বাণ হইয়া থাকে; সুতরাং দুঃখই বল, সংসারই বল, আর নির্ব্বাণই বল, ব্যক্তি ইহাদের মূলে

থাকিয়া এইগুলিকে নিয়মিত করেন ; কিন্তু ব্যক্তি যে কর্ম্ম করেন, তিনি সেই কর্ম্মের হেতু নহেন, কর্ম্মই তাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। একটি সূক্ষ্ম সূত্র যেমন শত শত কুসুমের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রবাহিত করিয়া বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কুসুম-গুলিকে একটি মালায় পরিণত করে, তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য কর্ম্মশক্তি বিভিন্ন মুহূর্ত্তের, বিভিন্ন দিনের, বাল্যযৌবনপ্রৌঢ়বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার এবং জন্মজন্মান্তরের একই জীবের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাদিগকে একত্ব দান করিতেছে। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমি যাহা আছি তাহা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমি যাহা ছিলাম, তাহারই পরিণামমাত্র। আমরা দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত পাইয়া থাকি ; কিন্তু তা' বলিয়া এইরূপ বলা চলেনা যে, যাহা দুগ্ধ, তাহাই দধি, তাহাই নবনীত, তাহাই ঘৃত ; অথচ দুগ্ধকে আশ্রয় করিয়াই দধি, নবনীত ও ঘৃতের উদ্ভব হইয়াছে। দধি দুগ্ধ নহে, আবার দুগ্ধ হইতে অন্য নহে। দধিত্বের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধত্ব নিরুদ্ধ হয় কিন্তু দুগ্ধত্বের ধর্ম্মপ্রবাহ উৎপদ্যমান দধিত্বে বিদ্যমান থাকে। এইরূপ শিশুর, যুবকের, প্রৌঢ়ের, বৃদ্ধের ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র হইলেও, একই দেহকে আশ্রয় করিয়া ঐ সকল অবস্থা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কর্ম্মের পরিণাম প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি দিনে আমাদের মধ্যে নব নব ব্যক্তিত্বের রচনা করিতেছে। বিদ্যুৎপ্রবাহ যেমন দোলককে একটা নিরন্তর গতি দান করে,

কর্ম্মপ্রবাহ তেমনি মানবজীবন লইয়া নানা ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার অশেষ খেলা খেলিতে থাকে। কত যুগ-যুগান্ত, কত জন্ম-জন্মান্তর এই খেলা চলিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি এই খেলার শেষ নাই? বৌদ্ধেরা বলেন, হাঁ, এই খেলা ফুরাইবে বটে, কিন্তু যাবৎ তোমার অবিদ্যা দূর না হয়, তাবৎ তোমাকে কর্ম্মের প্রভুশক্তির অধীনতা অনিচ্ছায়ও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যখনই তুমি নির্ম্মল-বোধি লাভ করিবে, তখনই কর্ম্মের সত্যপ্রকৃতি, তাহার যাদুবিদ্যা তোমার প্রজ্ঞাগোচর হইবে; তখন কর্ম্মই তোমাকে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইবে। কর্ম্মের শক্তি তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যোগ-সেতু। তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই এই যোগ-সেতু ভাঙ্গিয়া যায়, নির্ব্বাণলাভ হয় এবং নব জন্মলাভের আর সম্ভাবনা থাকে না। পুনঃপুনঃ জন্মলাভের যাহা হেতু বা কারণ তাহার উপরম হইলেই, আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কর্ষণ ও বপন না করিলে যেমন শস্যসংগ্রহের সম্ভাবনা দূর হয়, আসক্তি বা বাসনার ক্ষয় হইলে তেমনই জন্মলাভের সম্ভাবনা দূর হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালিবামাত্র যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং সকল দ্রব্য প্রত্যক্ষগোচর হয়, তেমনি সাধক প্রজ্ঞা লাভ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ের অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয় এবং চতুরার্য্যসত্য তাহার জ্ঞানগম্য হইয়া যায়। তখন তাঁহার স্থির-প্রজ্ঞা একদিক হইতে মনকে দৃঢ়বলে আঁকড়াইয়া ধরে এবং

অন্যদিক হইতে তৃষ্ণার মূলচ্ছেদন করে। তাঁহার তৃষ্ণা বিনষ্ট হইবামাত্র, জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে যে, আমাদের শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক ভালমন্দ যাহা কিছু কার্য্য, সমস্তই আমরা ভিতর হইতে তাগিদ্ পাইয়া করিয়া থাকি। কর্ম্ম আমাদিগকে করিতেই হয় এবং তাহার পরিণামও অবশ্যম্ভাবী। ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড যেমন ভূপৃষ্ঠে পড়িবেই, শুভাশুভ কর্ম্ম তেমনই নব নব সংস্কারের জন্মদান করিবেই। ধর্ম্মপদে উক্ত হইয়াছে—চিরপ্রবাসী নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয়-বন্ধুরা যেমন তাহাকে স্বাগত বলিয়া অভ্যর্থনা করে, ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পরও মানবের পুণ্যকর্ম্ম তেমনি তাহাকে বন্ধুর ন্যায় প্রতিগ্রহণ করে। শুভাশুভ কর্ম্ম আমাদিগকে পরিণাম হইতে পরিণামান্তরে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যায়। কর্ম্মের এই প্রভুশক্তি ইচ্ছামাত্রেই বিনাশ করিতে পারা যায় না। সাধনার প্রারম্ভেই কোন সাধকের মনে করা উচিত নহে, যেহেতু শুভাশুভ সর্ব্ববিধ কর্ম্মই আমার পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণের হেতু হইয়া মুক্তি-লাভে বাধা প্রদান করিতেছে, সেইজন্য আমি এখন হইতে পাপপুণ্য উভয় কর্ম্মই বর্জ্জন করিলাম। বৌদ্ধেরা বলেন, তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা আপনার ব্যক্তিত্ব-বিলোপের পূর্ব্বে একথা বলিবার অধিকার কোন সাধকেরই নাই। তিনি ঐ যে জোর করিয়া আপনার মনকে বলাইলেন, আমি পাপপুণ্য কোন কাজ

করিব না, তাহার ঐ গোঁড়ামি হইতেই নূতন সংস্কারের উদ্ভব হইবে। এই গোঁড়ামি তাহার কর্ম্ম হইল এবং তাহার পরিণাম তাহাকে ভুগিতে হইবেই। বেঙাচি যখন স্বাভাবিক নিয়মে বাড়িতে থাকে, তখন একদিন আপনা আপনিই তাহার লেজ খসিয়া পড়ে, এইজন্য কোন বলপ্রয়োগের দরকার হয় না; বরং জোর করিয়া অকালে লেজ খসাইয়া দিলে তাহার গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবারই কথা। সাধনার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হইতে হইতে সাধক যেদিন ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন সেইদিন তাহার তৃষ্ণার ক্ষয় হয়। এই সময়ে তিনি কর্ম্মের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। ইহার পূর্ব্বে জোর খাটাইতে গেলে কোন সুফল ফলিতে পারে না।

কর্ম্ম একদিকে যেমন আমারই সৃষ্টি, অন্যদিক হইতে এই কর্ম্ম আবার আমারই স্রষ্টা। কর্ম্মের পরাক্রম হইতে মুক্তিলাভ ব্যাপারটি সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় নহে, ইহা জীবন দিয়া সাধনীয় ব্যাপার। এই সাধনা-যজ্ঞে ব্যক্তিত্বকে আহুতি দিতে হইবে। এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে উঠিতে পারে যে, সাধনের দ্বারা সাধক যখন তাঁহার অহংবোধ বিলুপ্ত করিয়া দিলেন, তখনও তাঁহার দেহ বিদ্যমান থাকে; তাঁহাকে তখনও নানারূপ কার্য্য করিতে হয়। তাঁহার এই কর্ম্মগুলি কিরূপ? সংক্ষেপতঃ ইহার উত্তর এই যে, স্থিরপ্রজ্ঞ সাধকের বাহ্যক্রিয়াগুলি তৃষ্ণা-সম্ভূত নহে; রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত যে

শক্তি সাধারণ মানবকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে, সিদ্ধ সাধকের ক্রিয়াগুলি সেই শক্তি হইতে উদ্ভূত নহে। সুতরাং, তাঁহার কাজগুলি নূতন কর্ম্মের, নূতন ব্যক্তিত্বের, নূতন দুঃখের সৃষ্টি করিবে না।

অজ্ঞ শিশু দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া কাঁপিয়া উঠে; কিন্তু যখনই সে ঐ প্রতিবিম্বকে প্রকৃতরূপে জানিতে পাবে তখন তাহার ভয়ের সকল কারণ দূর হইয়া যায়। কর্ম্মের সত্যমূর্ত্তি আমাদের জ্ঞানগম্য নহে বলিয়া, কর্ম্ম আমাদের নিকট একটি বিভীষিকা হইয়া থাকে; কর্ম্ম পাপপুণ্যের শৃঙ্খল হস্তে আমা-দিগকে দণ্ড-পুরস্কার দিবার জন্য বিচারকের আসনে বসিয়া ক্রমাগত চোখ রাঙ্গাইতেছে, কিন্তু সাধকের নিকটে এই কর্ম্মের সমস্ত শক্তি পরাহত হয়; কারণ কর্ম্মতরু যে উৎসের রসধারা গ্রহণ করিয়া নানা শাখাপল্লবে, ফলেফুলে বাড়িতে থাকে, সাধক সেই উৎসের মুখই রুদ্ধ করেন; তাঁহার তৃষ্ণা ক্ষয় হইবামাত্র এই কর্ম্মতরু ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূতলশায়ী হইয়া থাকে। এইরূপে সাধক ভাল মন্দ সকল কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, শোক-শূন্য নির্ম্মল ও শুদ্ধ হইয়া থাকেন। তৃষ্ণার মূলচ্ছেদন করিয়া সাধক তখন অনাগারিক হইলেন, অর্থাৎ যে গৃহকারক তাঁহাকে জন্মজন্মান্তর নানা সংসারে ঘুরাইয়া অশেষ দুঃখ দিয়াছিলেন, তিনি সেই গৃহকারকের গৃহভিত্তি ও সাজসরঞ্জাম চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বৌদ্ধ-সাধক জানেন, শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক

কোন দুষ্ট কর্ম্ম করিলে, তাঁহাকে অবশ্যম্ভাবিরূপে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। চক্র যেমন ভারবাহী গর্দ্দভের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দুঃখও তেমনি দুষ্কৃতকারীর অনুসরণ করিয়া থাকে। বৌদ্ধকর্ম্ম নির্ম্মম, তাহার দয়া নাই, স্নেহ নাই। সুমার্জ্জিত দর্পণ যেমন নিখুঁত প্রতিবিম্ব প্রদান করে, কর্ম্মও তেমনি যথাযথ ফল প্রসব করিয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করেন, বৌদ্ধধর্ম্ম ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের আসনে কর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, এই ধর্ম্ম মানবাত্মাকে সকলের উচ্চ আসনে স্থান দিয়াছেন। যে হেতু সাধন দ্বারা মানব কর্ম্মের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন; একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, মানব আপনার অদৃষ্ট, আপনার পরিণাম আপনিই রচনা করিয়া থাকেন। মানব আপনিই আপনার শৃঙ্খল গড়িয়া থাকেন এবং আপনার শক্তিতেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মুক্তি অর্জ্জন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে মানবের বন্ধন-মুক্তির একাধিপত্য মানবকে দান করিয়া মানবাত্মাকেই চরম গৌরব প্রদান করিয়াছেন।
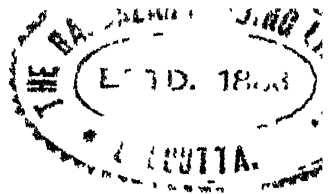
বৌদ্ধসাধনা

একদিকে ভোগবিলাসের আতিশয্য, অপরদিকে দুঃসহ কৃচ্ছ্র সাধন এই দুইয়ের মাঝখানে মুক্তির একটি উদার রাজবর্ত্ম প্রসারিত আছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধ সাধনার এই মধ্যপথটি আবিষ্কার করেন। মৃগদাবে তিনি তাঁহার পিপাসু ভক্তদিগকে বলিয়াছেন—বৎসগণ, কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা মুক্তির অন্বেষণ করিও না, অথবা ভোগবিলাসের আতিশয্যের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইও না। মৎস্যমাংস-ত্যাগ, অচেলকত্ব, মস্তকমুণ্ডন, জটাবল্কলধারণ, বিভূতিলেপন, হোম প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মনের কলুষ দূর হইতে পারে না। যাহার মোহ দূর হয় নাই, তাহার পক্ষে বেদপাঠ, দান, যাগযজ্ঞ, কঠোর তপস্যা, সমস্তই নিষ্ফল।

ক্রোধ, অমিতাচার, গোঁড়ামি, প্রতারণা, অহঙ্কার, দ্বেষ, ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি চিত্তকে মলিন করে; মৎস্যমাংসাদি ভোজনে মন অপবিত্র হয় না। পূর্ব্বোক্ত উভয়প্রকার বাড়াবাড়ির মধ্যবর্ত্তী সাধনমার্গের কথা আমি তোমাদিগকে বলিব। শরীরকে অসহ্য ক্লেশদান করিয়া অস্থিচর্ম্মসার করিলে সাধক নানারূপ দুর্ব্বল চিন্তায় ও সংশয়ে আকুল হইয়া উঠেন। উক্তরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়বিজয় দূরের কথা, পার্থিব সাধারণ জ্ঞান

অর্জ্জন করাও সম্ভবপর হয় না। যিনি তৈলের পরিবর্ত্তে জল দিয়া বাতি পূর্ণ করিবেন, তিনি কেমন করিয়া আলোক লাভ করিবেন। পচা কাষ্ঠ দ্বারা আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। অতএব কৃচ্ছ্র সাধনা ক্লেশদায়ক, অনাবশ্যক এবং নিষ্ফল।

যতদিন মানুষের অহংকার দূর না হয়, যতদিন ইহলোকের কিংবা পরলোকের সুখভোগের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণ থাকে, ততদিন তাহার তপশ্চর্য্যা পণ্ডশ্রমমাত্র। যিনি অহংকারকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের কোনো সুখভোগই কামনা করেন না। শরীরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরিমিত পানাহারে তাহার মন কদাচ কলুষিত হইবে না।

পদ্ম সরোবরের মাঝখানেই বাস করে, কিন্তু জল তাহার দলগুলিকে সিক্ত করিতে পারে না।

পক্ষান্তরে, যাবতীয় ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই শরীর ও মনকে দুর্ব্বল করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস। ইন্দ্রিয়ের সুখতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ও নীচ করিয়া থাকে।

তাই বলিয়া যুক্ত পান ও আহার অকল্যাণকর নহে। শরীরকে সুস্থ সবল রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীর সবল না হইলে কেমন করিয়া আমরা জ্ঞানের বাতি জ্বালাইব এবং মনকে বলিষ্ঠ ও নির্ম্মল করিয়া তুলিব। ভিক্ষুগণ, ইহাই মধ্যমার্গ। সর্ব্বদা উভয়বিধ আতিশয্য হইতে দূরে থাকিবে।

তথাগত কহিলেন—যিনি দুঃখের অস্তিত্ব, ইহার উৎপত্তির কারণ এবং নিবৃত্তির উপায় সত্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই মুক্তির সরলপথ অবলম্বন করিয়াছেন। সম্যক্ দৃষ্টি তাঁহার আলোক-বর্ত্তিকা, সম্যক্ সংকল্প তাঁহার পথপ্রদর্শক, সম্যক্ বাক্য তাঁহার পথিমধ্যস্থ প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র। তাঁহার গতি সরল, কারণ তাঁহার ব্যবহার বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ অন্নগ্রহণ করিয়া তিনি বিমল আনন্দলাভ করেন, কারণ সাধুজীবিকা তাহার অবলম্বন। সাধু প্রচেষ্টাই তাঁহার পাদক্ষেপ, কারণ তিনি কদাচ সংযমকে অতিক্রম করেন না। সম্যক্ স্মৃতি তাঁহার নিঃশ্বাস, কারণ সাধুচিন্তা শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার নিকট সহজ হইয়া থাকে। সম্যক্ ধ্যান তাঁহার শান্তি, কারণ জীবনের গভীরতত্ত্বসমূহের মনন ও ধ্যান দ্বারা তিনি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধত্বলাভের অর্থ আপনার ভিতরের বৃহৎ সত্যসম্বন্ধে বোধলাভ। সাধারণ জ্ঞান দ্বারা মানুষ যাহা জানে তাহা খণ্ড জ্ঞান কিন্তু মানুষের অধ্যাত্মদৃষ্টি যখন খুলিয়া যায়, তখন খণ্ডজ্ঞানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র সমগ্রের মূর্ত্তি তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টি মানুষের যতদিন না প্রস্ফুটিত হয়, ততদিন সে ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ অন্ধকারময় গণ্ডীর মধ্যে বাস করে।

ভগবান্ বুদ্ধ যে সাধনপ্রণালীর কথা বলিলেন, তাহার

স্থূল মর্ম্ম—আমিত্বের প্রসার দ্বারা আপনার ভিতরকার বৃহৎ সত্যকে জানা ; অথবা ব্যক্তিগত জীবনকে একেবারে বিশ্বজীবনের সহিত একীভূত করিয়া দেওয়া।

সাধনা দ্বারা অধ্যাত্মদৃষ্টি লাভ হইলে, অন্তররাজ্যের যে রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে ব্রহ্মই বল, আল্লাই বল, হোলিগোষ্টই বল, ধর্ম্মকায়ই বল, আর যে-কোন নামই দাও না, মূলে কোন প্রভেদ হইবেই না ; একই নিগূঢ় সত্যকেই সূচিত করিবে।

ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ হইতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে ইহা স্পষ্টই মনে হয় যে, তিনি সাধনা দ্বারা শরীর ও মন দুইকেই বলিষ্ঠ ও নির্ম্মল করিতে বলিয়াছেন। দেহকে আমরা যেমন মনের বহিরাবরণ বলিতে পারি, তেমনি মনকেও দেহের সূক্ষ্ম সত্তা বলিলে ভুল হইবে না। বাহিরে জীবের যে সত্তা দেহরূপে প্রকাশ পায়, ভিতরে সেই অনুভূতিকেই মন বলিতে পারা যায়। ব্যক্তির সমগ্র সত্তা এই দুইয়ের সমষ্টি। এই জন্য এক দিকে দেহকে যেমন পবিত্র রাখিতে হইবে, অপর দিকে প্রবৃত্তির ধূলিজাল ধুইয়া-মুছিয়া মনটিকে দর্পণতুল্য স্বচ্ছ করিতে হইবে। মনকে পবিত্র রাখিতে হইলে প্রতিপদে কঠিন সংযমের প্রয়োজন বলিয়াই বুদ্ধ নৈতিক অনুশাসনগুলির উপর এতটা জোর দিয়াছেন। তিনি যাগযজ্ঞক্রিয়াকাণ্ডের অসারতা ঘোষণা করিয়া এই কথাটিই বারবার বলিয়াছেন যে, আত্মশক্তি দ্বারা

ইন্দ্রিয়দমন কর এবং আপনাকে কল্যাণকর্ম্মে দান করিয়া চরম শ্রেয় লাভ কর।

জীব একটি নির্ম্মল উজ্জ্বল মন লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। নানাকারণে পরিবেষ্টনের প্রভাব যখন মনের সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দেয়, তখনই তাহার উপরে প্রবৃত্তির নানা জঞ্জাল স্তূপীভূত হইয়া উঠে; মানুষের মনটা তখন নানা প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রবল তরঙ্গের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র তরণীর মত ক্রমাগত আন্দোলিত হইতে থাকে। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে——

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি॥

বায়ু যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে জলে নিক্ষিপ্ত করে, তেমনি মন যদি অবশীভূত ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, তাহা হইলে ঐ ইন্দ্রিয়ের লালসা মনের প্রজ্ঞা হরণ করে। বুদ্ধ মানুষের এই অবস্থাকেই অজ্ঞানতার অবস্থা বলিয়াছেন।

এই অবিদ্যার বশে মানুষ 'অহং'কেই সত্য বলিয়া মনে করে; চিরসত্য, চিরমঙ্গলকে বিস্মৃত হইয়া যায়। এই অস্থায়ী অহং এবং স্থায়ী সত্য এই দুইয়ের প্রভেদ সুস্পষ্ট বুঝিতে হইবে। সাধক যে সত্যকে লাভ করিতে চান, সেই সত্য অবিনশ্বর, দেহের ন্যায় ইহার জন্ম-মৃত্যু, আদি অন্ত নাই। তিনি যখন তাঁহার ভিতরের সত্তাকে ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান হইতে বিমুক্ত করেন,

তখন ইহা স্বচ্ছ হীরকখণ্ডের ন্যায় সত্যের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; তিনি তখন প্রত্যেক পদার্থের ভিতরে সত্যকেই প্রত্যক্ষ করেন। বৃহৎ সত্যের সহিত সাধকের এই মিলনই মুক্তি বা নির্ব্বাণ। বৌদ্ধসাধনা যে উপায়ে এই অহংকে বিলোপ করিতে বলে, তাহা একমাত্র "নেতি নেতি" নহে। সাধক এক দিক দিয়া আপনাকে সঙ্কুচিত করিবেন, আবার অন্যদিক দিয়া আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিবেন।

ভগবান্ বুদ্ধ সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন, তোমরা——

১। প্রাণি-হত্যা করিও না।

২। অপহরণ করিও না।

৩। ব্যভিচার করিও না।

৪। মিথ্যা কহিও না।

৫। সুরাপান করিও না।

স্থূল দৃষ্টিতে এই পাঁচটি শীল সাধারণ নৈতিক নিষেধ বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নিয়ম পালন দ্বারা সাধককে যে গভীর সংযম স্বীকার করিতে হয়, তাহা দ্বারা হৃদয় গভীর বল লাভ করে। মানব চরিত্রের নীচবৃত্তিগুলি যখন প্রশমিত হয়, তখন ভিতরে বিবিধ কল্যাণকর সদ্‌গুণ জন্মিতে থাকিবেই। হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া মানব যখন অক্রোধী হয়, তখন ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে জীবপ্রীতির সঞ্চার হইতে থাকে।

ধনের প্রতি মানুষের যখন অতিমাত্র লুব্ধতা অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার দাক্ষিণ্যবৃত্তি জন্মিতে থাকে। কামলালসা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানুষের চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া উঠে, তখনই নিঃস্বার্থ প্রেম তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে। শীল অচ্ছিদ্র ও অখণ্ড হইলেই অধ্যাত্মবোধের সঞ্চার হয়। সুতরাং বুদ্ধের এই শীলগুলি একমাত্র বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতেও মানুষকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রত্যেক বৌদ্ধকেই বহুসংখ্যক সরল, সহজ, ধর্ম্মনীতি মানিয়া চলিতে হয়। বুদ্ধের এই স্বতঃসিদ্ধ শীলগুলি মানবের অন্তর্নিহিত নৈতিক বীর্য্যকে উদ্বোধিত করিবার পক্ষে আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইগুলিই মঙ্গলবর্ত্মের এবং নির্ব্বাণলাভের সোপান। তিনি নিম্নলিখিত শীলগুলিকে বিশেষ করিয়া মহামঙ্গল আখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঃ—

(ক) অসতের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা ও সঙ্গ এবং পূজার্হের পূজা।

(খ) সাধনার অনুকূল ক্ষেত্রে বাস, পূর্ব্বকৃত পুণ্যের বৃদ্ধিচেষ্টা, শীল-পালনে ও পুণ্যকার্য্যে আপনাকে সম্যগ্‌রূপে নিযুক্ত করা।

(গ) বহুসত্য, শিল্প ও বিনয়শিক্ষা এবং উত্তম বাক্যকথন।

(ঘ) পিতামাতার সেবা, স্ত্রীপুত্রের হিতসাধন, অব্যাকুল কর্ম্ম।

(ঙ) দান, অনবদ্য কর্ম্ম ও জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন।

(চ) পাপে অরতি, মদ্যপানে বিরতি এবং ধর্ম্মসাধনে উদ্যম।

(ছ) গৌরব, বিনয়, তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা।

(জ) ক্ষমা, প্রিয়বাক্য, সাধুদর্শন।

(ঝ) ব্রহ্মচর্য্য, তপশ্চর্য্যা ও আর্য্যসত্যদর্শন।

(ঞ) লোকনিন্দায় অচাঞ্চল্য, শোকে তাপে হৃদয়ের স্থৈর্য্য।

সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কি গভীব সংযমের এবং মঙ্গলব্রতের প্রতি কি গভীর অনুরাগ আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বৌদ্ধসাধক যাগযজ্ঞক্রিয়া-কাণ্ডে বিশ্বাস করেন না, তাঁহার পুরোহিত নাই, উদ্ধারকর্ত্তা গুরু নাই। সাধনার পথে তিনি সম্পূর্ণ একাকী, মানুষ বড়জোর তাঁহাকে পথটি দেখাইয়া দিতে পারেন এইমাত্র। একমাত্র আত্মশক্তিতে সমগ্র পথ বহিয়া তাঁহাকে চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতে হইবে। মৃত্যুশয্যায় ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার উপস্থায়ক আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—আনন্দ, আমার জীবনের আশী বৎসর অতীত হইল, আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি এক্ষণে চলিলাম; দেখ, আমি এতকাল নির্ভয়ে নিজের উপর নির্ভব করিয়া চলিয়াছি। তোমরাও আত্মনির্ভর শিক্ষা কর। তোমরা নিজেরাই নিজের প্রদীপ হও, নিজেরাই নিজের নির্ভর-দণ্ড হও।

সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। আপনি ভিন্ন অন্য কাহারও উপর নির্ভর করিও না।

বৌদ্ধসাধনার যেমন "না"-য়ের দিক আছে, তেমনি ইহার একটী আশ্চর্য্য "হাঁ"-য়ের দিকও আছে। নির্ব্বাণকামী সাধক দুঃখের প্রেরণায় যেমন জীবের শরীরকে ব্যাধিমন্দির, ক্ষণস্থায়ী, দুঃখময় ও জন্মমৃত্যুর অধীন মনে করেন, তেমনি তাঁহাকে ভাবিতে হইবে, জীবমাত্রেই তুল্য, কোনো জীবই ঘৃণার পাত্র নহে, সকলকেই সমান প্রীতি করিতে হইবে। সাধককে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবমানব, জীবজন্তু সকলের সুখকামনা করিতে হইবে, শত্রুমিত্র সকলেরই কল্যাণ-ভাবনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ থাকিবে। সকলে রোগ-শোক-ব্যাধি-মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করুক, এই শুভচিন্তা তাঁহার প্রতিদিনের ভাবনা হইবে।

দুঃখীর দুঃখে সাধকের হৃদয় করুণায় দ্রব হইবে, সুখীর সুখে তাঁহার চিত্ত নন্দিত হইবে। তিনি ভাবিবেন,

দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতো বা সম্ভবেসী বা
সবেব সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা॥

কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট, কি দূরবাসী কি নিকটবাসী, কি ভূত-কালের কি ভবিষ্যৎকালের, যে কোন প্রাণী হউক না কেন—সকলে সুখী হউক। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশুভ,

উপেক্ষা বৌদ্ধ সাধকের এই পঞ্চ প্রকারের ভাবনা ভাবিতে হইবে।

বৌদ্ধসাধনাকে আমরা জ্ঞানমূলক প্রেমের সাধনা বলিতে পারি। কোশলরাজ্যে মনসাকৃৎ গ্রামে আম্রকাননে ভগবান্ বুদ্ধ যে সময়ে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠনামক দুই ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট ধর্ম্মরহস্য মীমাংসার জন্য গমন করেন। তিনি যুবকদ্বয়কে বলিলেন—তথাগতের ধর্ম্মসাধনার প্রারম্ভে প্রেম ; প্রেমেই এই সাধনার উন্নতি ও গতি এবং প্রেমেই এই সাধনার পরিণতি। * * *

তথাগত তাঁহার প্রীতিপূর্ণ মন ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহার ঊর্দ্ধ, অধঃ, পুরঃ, পশ্চাৎ সর্ব্ব স্থানই প্রীতির রসে পূর্ণ হইয়া উঠে।

বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রী বৌদ্ধদর্শনে অতি উজ্জ্বলরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনে প্রশ্ন উত্থাপিত হইল, ভিক্ষু কি প্রকারে মৈত্রীযুক্ত চিত্তের দ্বারা দিকসমূহকে প্রকাশিত করিয়া বিহরণ করিবেন? উত্তরে উক্ত হইয়াছে,—লোকে যেমন কোন এক হৃদয়ঙ্গম প্রিয়ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া মৈত্রী করিয়া থাকে, এইরূপ সমস্ত জীবকে মৈত্রীর দ্বারা প্রকাশিত করিতে হইবে। অভিধর্ম্মপিটকে মৈত্রী-ভাবনা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে —সাধক ভাবিবেন, সমস্ত জীব বৈরীরহিত হইয়া, বাধারহিত হইয়া, সুখী হইয়া নিজেকে পরিচালিত করুক। সমস্ত প্রাণী,

সমস্ত ভূত, সমস্ত ব্যক্তি ও জন্মগ্রাহী বৈররহিত হইয়া বাধারহিত হইয়া সুখী হইয়া নিজেকে পরিচালিত করুক। সমস্ত স্ত্রী, সমস্ত পুরুষ, সমস্ত আর্য্য, সমস্ত অনার্য্য, সমস্ত দেব, সমস্ত মনুষ্য ও সমস্ত নরকাদিস্থিত জীব বৈররহিত হইয়া, বাধারহিত হইয়া, সুখী হইয়া নিজেকে পরিচালিত করুক।

বৌদ্ধসাধকের ধ্যানের বিষয় চারিটি। প্রথম—নির্জ্জনে ধ্যান করিয়া চিত্ত হইতে সর্ব্বপ্রকার পাপলালসা-বিমোচন। দ্বিতীয়—পবিত্র আনন্দ ও সুখের ধ্যানের দ্বারা চিত্তসমাধান। তৃতীয়—আধ্যাত্মিক বিষয়ের ধ্যান দ্বারা চিত্তবিনোদন। চতুর্থ—চিত্তকে সুখ ও দুঃখের ঊর্দ্ধে উন্নত করিয়া পবিত্রতা ও শান্তির মধ্যে বিহার।

বৌদ্ধসাধকের লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। তিনি জানেন, অজ্ঞানতা-রূপ কুহেলিকায় মন আবৃত বলিয়াই আমরা স্বার্থপর; চরম-লক্ষ্যসম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়াই আমরা প্রবৃত্তির দাস; সকলের সহিত মূল ঐক্যসম্বন্ধে অজ্ঞান বলিয়াই আমরা ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকি।

বৌদ্ধসাধনা জ্ঞানের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে নীরস একঘেঁয়ে জ্ঞানের সাধনা বলিয়া থাকেন। বোধিলাভ যে সাধনার চরম লক্ষ্য তাহাকে জ্ঞানের সাধনা বলা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, বৌদ্ধসাধনার উদ্ভব, প্রয়াণ ও পরিণতি প্রেমে। প্রেমের

পরিব্যাপ্তিই বৌদ্ধসাধুর প্রতিদিনের সাধনা, তাঁহার মনন ও ধ্যান হইতেই ইহা বোঝা যাইতে পারে।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে প্রথম নিপাতে দ্বিতীয়বর্গে বুদ্ধ বলিতে-ছেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য এক ধর্ম্মও দেখিতেছি না যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ অর্থাৎ কামাভিলাষ উৎপন্ন না হয় বা উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। হে ভিক্ষুগণ জ্ঞানপূর্ব্বক শরীরের অনিত্যতা চিন্তা করিলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি অন্য একধর্ম্মও দেখিতেছি না, যাহার প্রভাবে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ অর্থাৎ হিংসা এবং পরের অনিষ্টকামনা ইত্যাদি উৎপন্ন হয় না কিংবা উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীণ হয়। হে ভিক্ষুগণ, জ্ঞানপূর্ব্বক মৈত্রী চিত্ত-বিমুক্তি মনন করিলে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদ বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ মন যখন সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীময় হয় তখন কামাভিলাষ, পরের অহিত-চিন্তা ও ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দূর হইয়া থাকে।

বৌদ্ধসাধনা

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বৌদ্ধসাধনার গোড়াকার কথা অবিদ্যার সহিত সংগ্রাম। বোধিদ্রুমতলে মহাপুরুষ বুদ্ধ যে দিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন, সেদিন মানবজীবনের কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইল? তিনি তাঁহার নবলব্ধ প্রজ্ঞা-দৃষ্টির দ্বারা দেখিলেন—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্মলাভ। এই জন্ম হইতেই মানব রোগশোকজরাব্যাধিমৃত্যু ও দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

মানবের এই মহদ্দুঃখের অস্তিত্ব, ইহার উৎপত্তির কারণ এবং নিবৃত্তির উপায়-নির্দ্ধারণেই মহাপুরুষ বুদ্ধের প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। অবিদ্যাকেই তিনি মূলব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অবিদ্যার বিনাশ হইলে ইহ-জীবনেই মানব নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। বুদ্ধ ধম্মপদে বলিয়াছেন—

অবিজ্জা পরমং মলং।

তিনি সাধককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—এতং মলং

পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিক্‌খবো। হে ভিক্ষুগণ, এই মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হও। এই অবিদ্যার বিনাশের জন্যই তিনি অষ্ট আর্য্য-মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহারই সহিত সংগ্রামের জন্য সাধক মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ভাবনা অবলম্বন করেন ; এই জন্যই তিনি মানব-জীবনের অপরিহার্য্য দুঃখ এবং সমগ্র প্রাণীর মূল ঐক্য চিন্তা করিয়া থাকেন। শীলগ্রহণেরও তাৎপর্য্য ঐ নিকৃষ্টতম মলিনতার বা অবিদ্যার বিনাশ।

অংশতঃ এই অবিদ্যাকেই পরাভূত করিয়া সাধক যখন সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ কবেন, তখনও পাপ প্রলোভনের নানা মূর্ত্তি ধরিয়া এই অবিদ্যাই তাঁহাকে নানা দিক হইতে আক্রমণ করিয়া থাকে। সাধক জানেন অবিদ্যা তাঁহাকে বিশ্ব হইতে বিযুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র "অহং"-এর সংকীর্ণ প্রাচীর মধ্যে আটক করিয়া রাখিয়াছে ; মাঝে মাঝে চকিতের ন্যায় তিনি তাঁহার আপনার সেই বৃহৎ সত্তা অনুভব করেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রসত্তাকেই সত্য বলিয়া মনে করেন। অবিদ্যার বশে প্রবর্ত্তকের মনে এই সময়ে কখনো কখনো স্বীয় অবলম্বিত আর্য্যমার্গের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে ; আবার কখনো সদ্‌ধর্ম্ম ও শুভ প্রচেষ্টার উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া, তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠেন। এই সংশয়-দোদুল্যমান চিত্ত লইয়াই তাঁহাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। তিনি অনলস হইয়া—

অভিত্‌থরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে—

মনের পাপ ধুইয়া-মুছিয়া কল্যাণের দিকে প্রাণপণে ধাবিত হইতে থাকেন। তাঁহার শুভ উদ্যম এবং তাঁহার দৃঢ়তা একটির পর একটি করিয়া সংশয় গ্রন্থিগুলি উন্মোচন করিতে থাকে। তাঁহার সাধনপথে বাধার অন্ত নাই, ভোগলালসা ইহলোকের এবং পরলোকের সুখেচ্ছা ও অহংকার তাঁহার সম্মুখে সুদৃঢ় প্রাচীর-রূপে উপস্থিত হয়। তিনি শীলপালনে ও ধর্ম্মপ্রচেষ্টায় অবিচলিত থাকিয়া, ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। দিনের পর দিন তাঁহার অধ্যবসায়ের প্রভাবে ক্রমশঃ বাধাগুলি ভূমিসাৎ হইতে থাকে। প্রতিদিন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সাধু বৃত্তিগুলির প্রস্ফুরণের চেষ্টা করেন, নব নব সদ্‌গুণ অর্জ্জনের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। তিনি আপনার ভিতরে আপনি জাগরিত থাকিয়া অভ্যস্ত পাপগুলি প্রক্ষালন করিয়া ক্রমশঃ নির্ম্মলতর হইতে থাকেন এবং নিজের মনকে সাধু চিন্তার দ্বারা আবৃত করিয়া পাপের আক্রমণ-পথে নিত্য-নিয়ত বাধা প্রদান করেন।

এইরূপ কঠোর সংগ্রামের মধ্যদিয়া বৌদ্ধসাধক যে অবিদ্যাকে আংশিক পরাস্ত করিয়া সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া-ছিলেন, পরিশেষে সেই অবিদ্যার মূলোৎপাটন করিয়া বোধিলাভ করেন।

এই সময়ে সাধক আপনার ক্ষুদ্র সত্তা বিশ্বসত্তার সহিত মিলাইয়া দিয়া আপনার সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পান।

এই যে সাধনপ্রণালীর কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে এক হিসাবে কোনো নূতনত্বই নাই। পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ খণ্ডভাবে প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সাধনায় যেমন কঠোব তপশ্চর্য্যা নিষ্ফল বলিয়া উক্ত হইল; সংযম বন্ধনমুক্ত ভোগবিলাসও তেমনি নিন্দিত হইল। বৌদ্ধ-সাধন-প্রণালী প্রেমহীন শুষ্কজ্ঞান নহে; অথবা জ্ঞানহীন বিকৃত প্রেম বা ভাবোন্মাদ নহে। বৌদ্ধসাধনা যোগ ও ভোগের সামঞ্জস্য; জ্ঞান ও প্রেমেব সমন্বয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায়—যাহা কিছু অকল্যাণ তাহার বর্জ্জন, যাহা কিছু মঙ্গল তাহার গ্রহণ এবং মনকে সর্ব্বপ্রকার বাধা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া সর্ব্বত্র ইহার পরিব্যাপ্তি; ইহাই বৌদ্ধসাধনা।

বৌদ্ধধর্ম্ম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভিত্তি সুদৃঢ় কিনা পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার বিচার করিতে পারেন। কিন্তু এই ধর্ম্মের শীল ও মৈত্রী মানবহৃদয়ে চির-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জ্ঞানরূপে এই ধর্ম্মের তত্ত্ব সাধকের হৃদয়ে যে ভাবে বিরাজ করিয়া থাকে, করুক; এই ধর্ম্মের যে অংশ সমগ্র জাতির এবং সমস্ত জীবের সেবায় ও কল্যাণ-সাধনে প্রেমের মঙ্গলমূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার মনো-হারিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধসাধু জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আতপক্লিষ্টকে পাদপচ্ছায়া, তৃষিত পান্থকে পথের মধ্যস্থলে জলাশয় ও বিশ্রাম-ভবন, অসহায় রোগীকে

সেবালয় এবং রোগার্ত্ত জীবকে চিকিৎসালয় দান করিয়াছেন। বৌদ্ধ সাধুদের অসামান্য স্বার্থত্যাগ, সংযম, দয়া ও প্রেমের দৃষ্টান্ত পাঠকমাত্রেরই চিত্ত বিস্ময়রসে অভিষিক্ত করে, সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধ সাধকের চরম লাভ নির্ব্বাণ। যে সাধনপ্রণালীর মধ্য দিয়া, তিনি তাঁহার লক্ষ্যে উপনীত হন, তাহা আলোচনা করিলে মনে হয় নির্ব্বাণ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও বিশুদ্ধ প্রেমেরই চরম পরিণতি ; ইহা নাস্তিবাচক শূন্যতা নহে। এই সাধনার নির্ব্বাণ, সমস্ত কুপ্রবৃত্তির নির্ব্বাণ—ক্ষুদ্র আমিত্বের নির্ব্বাণ—হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপলালসার প্রদীপ্ত শিখার চিরনির্ব্বাণ। আর এক দিক হইতে বলা যায়, নির্ব্বাণ—পাপপ্রবৃত্তির নির্ব্বাণ, প্রেমের নহে—ক্ষুদ্র সত্তার নির্ব্বাণ, বৃহৎ সত্তার নহে—অকল্যাণের নির্ব্বাণ, কল্যাণের নহে।

নির্ব্বাণকে দার্শনিকগণ নানারূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য নানা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। নির্ব্বাণ যদি বৌদ্ধদর্শনের শূন্যতা হয়, তাহা হইলেও ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পরম পদার্থ। সেই শূন্যতা "নাস্তি" নহে ; তাহা "অস্তি" "নাস্তি" দুয়েরই অতীত, তাহা বাক্য মনের অনধিগম্য, তাহা অক্ষর, অপ্রমেয় ও গম্ভীর। এই শূন্যতাকে যদি পরমাত্মা, ব্রহ্ম, বিশ্বসত্তা, পূর্ণতা, Everlastnig yea বা এই শ্রেণীর অন্য কোনো একটা নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে গুরুতর ভ্রম হয় বলিয়া মনে হয় না। যে শূন্যতা একে-

বারেই নাস্তি তাহা এমন কিছু লোভনীয় নহে যে ইহারই জন্য সাধক প্রাণপণ সংগ্রাম করিবেন। জ্ঞানমূলক "নেতির" দ্বারা বৌদ্ধসাধক আপনার ছোট অহংকে সংকুচিত করেন; তিনি "উসৃস্থকেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনুসৃসুক।"—আসক্ত মনুষ্যদের মাঝখানে অনাসক্তভাবে বিচরণ করেন; তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা—"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খারা পরমা দুখা" লোভকে পরম রোগ এবং সংস্কারকে পরম দুঃখ জানিয়া পরম সুখ নির্ব্বাণ লাভ করেন। আর একদিক দিয়া তিনি তাঁহার বৃহৎ সত্তাকে মৈত্রীভাবনাদ্বারা ভূলোকে, দ্যুলোকে, স্বর্লোকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া থাকেন। বৌদ্ধসাধনা যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে এই দুইটি দিকই ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

অন্তিম শয্যায় মহাপুরুষ বুদ্ধ এই সাধনার যে প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছেন মহাপরিনিব্বান সুত্তে তাহা বর্ণিত আছে। ইহাতে তিনি চারিটি ধ্যান, চারিটি ধর্ম্ম-প্রচেষ্টা, চারিটি ঋদ্ধিপাদ, পাঁচটি নৈতিক বল, সাতটি বোধ ও আটটি পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত এই সাধনা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমেরই সাধনা। উরগবগ্‌গে মেত্তাসুত্তে সাধকের মৈত্রী ও কল্যাণ ভাবনার যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা অতীব চিত্তস্পর্শী। তথায় বলা হইয়াছে যে সাধক শান্তিপদ নির্ব্বাণ লাভ করিতে চাহেন; তিনি কর্ত্তব্য-পালনে কুশল, সরল, বিনীত ও নিরভিমান হইবেন; তাঁহার অভাব অল্পই থাকিবে, অল্পেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহার

কোনো দুর্ভাবনার হেতু থাকিবে না, তিনি জিতেন্দ্রিয়, সদ্‌-বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ ও অনাসক্ত হইবেন ; তিনি ক্ষুদ্র পাপও আচরণ করিবেন না, তিনি ভাবিবেন সকল জীব সুখী ও নিরাপদ্ হউক। তিনি ভাবিবেন, সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, দৃষ্ট অদৃষ্ট, দূরবর্ত্তী সমীপবর্ত্তী, ভূতকালের, ভবিষ্যৎকালের সকল প্রাণী সুখী হউক ; তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করিবেন না, কাহাকেও ঘৃণা করিবেন না, অথবা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও অহিত চিন্তা করিবেন না ; জননী যেমন নিজের আয়ু দ্বারা একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করেন, তিনিও তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় প্রীতি রক্ষা করিবেন ; জগতের ঊর্দ্ধে, নিম্নে, চতুর্দ্দিকে তিনি তাঁহার হিংসাশূন্য, বৈরশূন্য, বাধাশূন্য অপরিমেয় প্রীতি ব্যাপ্ত করিয়া দিবেন ; দাঁড়াইতে, বসিতে, চলিতে, শুইতে, যাবৎ না নিদ্রিত হইয়া থাকেন তাবৎ, তিনি এই মৈত্রীভাবনায় নিবিষ্ট থাকিবেন। চিত্তের এই অবস্থাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র ইহাকে ব্রহ্মবিহার বা সাধুজীবন আখ্যা দিয়াছেন। বৌদ্ধসাধনার শিরোভাগে এই অনির্ব্বচনীয় মৈত্রী ও মঙ্গল বিরাজিত। এই সাধনা মানবকে পরিণামে বিনাশের মধ্যে লইয়া যাইতে পারে না। পূজ্যপাদ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একপত্রে লিখিয়াছেন ঃ——

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কি, সেটা দেখ্‌তে গেলে তাঁর

শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ্ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চল্‌বে না, যে অংশ পজিটিভ্ সেইখানে তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দূরই আসল কথা হয়, তাহ'লে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়; কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে ভালবাসার দিকেই আসল লক্ষ্য। আমদের অহং আমাদের ভালবাসা স্বার্থের দিকে টানে, বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে আনন্দের দিকে নয়। এইজন্য অহংকে লোপ ক'রে দিলেই সহজে সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। "পূর্ণিমা" ব'লে "চিত্রায়" একটা কবিতা আছে; তা'তে আছে একদিন সন্ধ্যার সময়ে নৌকায় ব'সে সৌন্দর্য্যতত্ত্বসম্বন্ধে একটি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেই বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি নৌকার সমস্ত জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত ক'রে দিলে। ঐ ছোট বাতি আমার টেবিলে জ্বল্‌ছিল ব'লে আকাশভরা জ্যোৎস্না ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি। বাহিরে যে কত অজস্র সৌন্দর্য্য ভূলোক দ্যুলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা কর্‌ছিল তা' আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেই রকম জিনিষ; অত্যন্ত কাছের এই জিনিষটা আমাদের বোধশক্তিকে চারিদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে যে অনন্ত আকাশভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারি নি। অহংটুকু যেদিন নির্ব্বাণ হবে অমনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্ত্তে

আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধের লক্ষ্য তা' বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রীবিস্তার করতে বল্‌চেন। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ কর্‌তে গেলে নিজের অহংকে নির্ব্বাপিত কর্‌তে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন; নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য তাঁর চারদিকে ভিড় করে আস্‌ত না।

মহাবগ্‌গে ষষ্ঠখণ্ডে লিচ্ছবি-সেনা-নায়ক নিগ্রন্থ সাধু সিংহের সহিত মহাপুরুষ বুদ্ধের একটি আলোচনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁহার সাধনার দুইদিকই সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। অতি সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম এই—হে সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদ অস্বীকার করি ইহা সত্য, কারণ আমি শিক্ষা দিয়া থাকি কোনো সাধক যেন বাক্যে, কার্য্যে বা চিন্তায় এমন কোনো ক্রিয়া করেন না যাহা অকল্যাণকর কিংবা যাহা মনে অকল্যাণ ভাব জন্মাইয়া দেয়।

হে সিংহ, আমি ক্রিয়াবাদ স্বীকার করি ইহাও সত্য, কারণ আমি শিক্ষা দিয়া থাকি, সাধক যেন বাক্যে, কার্য্যে বা চিন্তায় এমন ক্রিয়াই করেন যাহা কল্যাণকর কিংবা যাহা মনে কল্যাণের ভাব জন্মাইয়া দেয়।

হে সিংহ, আমি উচ্ছেদবাদ ঘোষণা করি ইহা সত্য; কারণ আমি অহংকার, কামাভিলাষ, কু-ভাবনা ও ভ্রান্তির উচ্ছেদ

ঘোষণা করি। কিন্তু আমি ক্ষমা, প্রেম, দাক্ষিণ্য ও সত্যের উচ্ছেদ ঘোষণা করি না।

হে সিংহ, আমি বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় অধর্ম্মাচরণ জুগুপ্সিত বা ঘৃণিত বলিয়া মনে করি।

হে সিংহ, আমি অহংকার, কামাভিলাষ, কুভাবনা ও ভ্রান্তির বিনয় অর্থাৎ অপনয়ন ঘোষণা করি; কল্যাণভাবের অপনয়ন ঘোষণা করি না।

হে সিংহ, আমি হৃদয়ের অকল্যাণভাবের তপ অর্থাৎ দাহন ঘোষণা করি, কল্যাণভাবের দাহন ঘোষণা করি না।

বুদ্ধের উল্লিখিত উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, বৌদ্ধ-সাধনা, বিশুদ্ধ আত্মহত্যার সাধনা নহে। বৌদ্ধসাধক আপনার অহংকার, কামাভিলাষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যে শান্তিপ্রদ নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই অবস্থাটিই সাধনার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা কি না জোর করিয়া তাহা বলা চলে না। অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধে বুদ্ধের নিস্তব্ধতা আলোচনা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, মানববুদ্ধি আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চতম অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, তাহার বাহিরে অতি উচ্চতম অবস্থাও আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বুদ্ধের অনন্ত-প্রসারী আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নির্ব্বাণের সীমাহীন আকাশ ভেদ করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার নিস্তব্ধতাই ইহার একটি প্রমাণ। তিনি তাঁহার অনুগত ভক্ত ও সাধারণ লোকের দৃষ্টির সম্মুখে শান্তি ও কল্যাণের আকর নির্ব্বাণ-লোক

উপস্থাপিত করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন ; সে লোক অতিক্রম করিয়া কোন্ লোক রহিয়াছে তাহা বলেন নাই।

বুদ্ধের এই নির্ব্বাণ সাধনার একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। তিনি সাধকের সম্মুখে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। সাধক এই পথে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিবেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও অনিশ্চিততত্ত্বের মধ্যে পড়িয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে না। সাধকেব চলিবার, বলিবার ভাবিবার, ধ্যান করিবার, মনন করিবার বিষয়গুলি সুনির্দ্দিষ্ট এবং ধারাবাহিকরূপে সুবিন্যস্ত। কল্যাণপথগামী সাধককে যতখানি ইঙ্গিত করিলে তিনি তাঁহার লক্ষ্যস্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি তাঁহাকে ততখানিই ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। বোগীকে তিনি ঔষধ দিয়াছেন, হয়ত অনাবশ্যক বোধে তাহাকে তাহার ব্যাধির মূলকারণটি বলেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়াও বুদ্ধ অনেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের রহস্যসম্বন্ধে নিরুত্তর ছিলেন; তাঁহাব সেই নিস্তব্ধতা নিন্দকদলের আক্রমণের একটি বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। তা’ বলিয়া এই সাধনার চরমলক্ষ্যকে কোনক্রমে পরিমিত বলা চলে না। নিরবশেষ আত্মত্যাগ করিয়া যে লাভ তাহাই পরম লাভ। সুতরাং বৌদ্ধসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম শ্রেয়োলাভ করেন, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

বৌদ্ধ সাধকের আদর্শ

জীবের অপরিহার্য্য দুঃখ মহাপুরুষ বুদ্ধের চিত্ত করুণায় দ্রব করিয়াছিল। তিনি যে আষ্টাঙ্গিক সাধনমার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন সেই সাধনপ্রণালী দুঃখ নিবৃত্তিরই সাধনা। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রজ্ঞাদৃষ্টিদ্বারা শোকশল্যের সংস্থান অবগত হইয়াই তিনি সর্ব্বজীবের হিতার্থ এই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নির্ব্বাণলাভের জন্য যাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে সেই সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির মধ্যে তিনশ্রেণীর সাধক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের একদল তথাগতের বাণী শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারই নির্দ্ধারিত পথে বিহরণ করেন। দুঃখের অস্তিত্ব, উদ্ভব, নিবৃত্তি এবং নিবৃত্তির উপায় এই চতুরার্য্য সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া নির্ব্বাণলাভই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহারা "শ্রাবক" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকগণও বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা শান্তিপদ নির্ব্বাণলাভের নিমিত্ত তথাগতের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করেন। জন্মহেতু জীবকুল জরাব্যাধি ও মৃত্যুর যাতনা ভোগ করিতেছে, এইজন্য অবিদ্যা হইতে কার্য্যকারণপরম্পরায় কিরূপে জীবের উদ্ভব হইল ইহারা প্রজ্ঞাদ্বারা তাহারই উপলব্ধি করিয়া নির্ব্বাণলাভ করিয়া থাকেন। ইহারা "প্রত্যেক বুদ্ধ" নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

অপর শ্রেণীর সাধকগণ "বুদ্ধত্ব" ও "সর্ব্বজ্ঞত্ব" লাভের জন্য পূর্ব্বপূর্ব্ব বুদ্ধদের ন্যায় নির্ব্বাণসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিশ্বপ্লাবিনী করুণার প্রেরণায় ইহারা বিশ্ববাসী দেবমানবের সুখকল্যাণ কামনায় নির্ব্বাণসাধনা করিয়া থাকেন। ইহারা "বোধিসত্ত্ব-মহাসত্ত্ব" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সাধকই নির্ব্বাণ সাধনায় নিরত হইলেও শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধদের সাধনার সহিত বোধিসত্ত্বদের সাধনার আকাশপাতাল প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। বোধিসত্ত্ব কখনো সংসারের কলকোলাহল হইতে দূরে নিভৃত শৈলগুহায় প্রবেশ করিয়া দেহের নশ্বরতা ধ্যান করেন না। আপনার সুখ ও আপনার কল্যাণের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নহেন। অবিমিশ্র শান্তির লোভে তিনি নির্জ্জনতার সন্ধান না করিয়া, সর্ব্বজীবের নির্ব্বাণসাধনার নিমিত্ত সংসারের কোলাহলের মধ্যেই প্রবেশ করেন। যাহারা অবিদ্যার বশে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি তাহাদের হিতার্থে উৎসর্গ করেন, তাহাদের নিকট নির্ব্বাণের অমৃতময়ী বাণী প্রচার করিয়া থাকেন।

আপনার হিতার্থে আপনার দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধগণ কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের সাধনা প্রেমমূলক নহে, অনন্ত জীবের অশেষ দুঃখ তাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা বাসনার উচ্ছেদ

সাধন করিয়া যে-নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন, উহা বাসনার নির্ব্বাণ মাত্র, প্রেম, করুণা ও দাক্ষিণ্যের চরম অভিব্যক্তি নহে। কারণ ইহারা সাধনার শেষে যে সার্থকতা লাভ করিলেন সমদুঃখী মানব তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইল না। সিদ্ধি লাভের পরে তাঁহারা পাপভারাক্রান্ত সাধারণ নরনারীর সহিত মিশিতেও সংকোচ বোধ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, সর্ব্বজীবের নির্ব্বাণ সাধনা তাঁহাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও শক্তির অতীত।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব আপনাকে বুদ্ধেরই স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অনুভব করেন, তিনি একাকী সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুখী নহেন; তিনি বলেন—"আমি বুদ্ধত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া স্বয়ং যেমন সংসার-সমুদ্র পার হইব, তেমনি সমস্ত দেবমানবকে পরপারে বহন করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিব। যখন দেখিতেছি. আমার প্রতিবেশী আমারই ন্যায় দুঃসহ দুঃখের বোঝা বহন করিতেছে, তখন আমি কেবল মাত্র আপনারই দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইব কেমন করিয়া?" এই নিমিত্ত তিনি সকল জীবের দুঃখের ভার আপনার শিরে গ্রহণ করিয়া অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

এই অসমসাহসিক সাধক কোন্ ভাবনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই সাধনসমরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন? তিনি ভাবেন— অবিদ্যার বশে জীবকুল অহোরাত্র পাপাচরণে নিরত রহিয়াছে

এবং তাহারই ফলে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহাদের দুর্গতি বর্ণনাতীত। তাহারা তথাগতকে স্বীকার করে না, তাহারা মঙ্গলকর উপদেশ গ্রাহ্য করে না, সাধকদের প্রতিও তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। এই ভাবনার প্রথম অভ্যুদয়ে বোধিসত্ত্বের চিত্ত শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়; সেই শোক মন্দীভূত হইবামাত্রই জীবের সেবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে অবিচলিত সাধু সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে, তিনি তখন সকল জীবের অবিদ্যার বোঝা গ্রহণ করিয়া সকলের জন্য নির্ব্বাণ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার বোঝা যতই ভারী হউক না কেন, সঙ্কল্পের সুদৃঢ় বর্ম্মে সমাবৃত হৃদয় কদাচ দমিয়া যায় না। তাঁহার প্রজ্ঞা, তাঁহার করুণা, তাঁহার মৈত্রী, তাঁহার সুকৃতি সমস্তই অনন্তজীবের হিতসাধনে উৎসৃষ্ট।

কি ব্রত গ্রহণ করিয়া উদ্বুদ্ধচিত্ত নবীন বোধিসত্ত্ব সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধগ্রন্থকার শান্তিদেব তৎপ্রণীত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তথায় উক্ত হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব এইরূপ সঙ্কল্প করেন—বুদ্ধদের আরাধনা করিয়া, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া, স্বকৃত পাপ স্বীকার করিয়া আমি যে পুণ্য অর্জ্জন করি তাহা জীবের হিতে ও বোধিলাভের আনুকূল্যে ব্যয়িত হউক। যাহারা ক্ষুধার্ত্ত আমি তাহাদের অন্ন, যাহারা তৃষিত আমি তাহাদের পানীয় হইতে ইচ্ছা করি। আমি আমাকে, আমার বর্ত্তমান ও জন্ম-জন্মান্তরের ভাবী সত্তাকে জীবকল্যাণে উৎসর্গ করিলাম।

পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি আপনাকে তাঁহাদের নিকটে অশেষ ঋণী মনে করিয়া সেই ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া সমগ্র জীবের নির্ব্বাণ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বোধিসত্ত্বের এই নির্ব্বাণসাধনা উচ্ছেদমূলক নহে, তিনি এক দিকে আপনার ভোগ বাসনা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিয়া যেমন স্বার্থমূলক অহংকে সঙ্কুচিত করেন, অপর দিকে করুণায় বিগলিত হইয়া, মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আপনাকে লোকলোকান্তরে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া থাকেন। তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়াও করুণ-হৃদয়, বিনয়ী ও সহিষ্ণু। তাঁহার সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা এবং সকল ধ্যানের মূলে জীবের প্রতি অপ্রমেয় সহানুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রতগ্রহণ করিবামাত্রই বোধিসত্ত্ব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন কেহ যেন ভ্রমেও এমন কথা মনে না করেন। পাপ-প্রলোভনের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে শীল গ্রহণ করিতে হয় সত্য, কিন্তু তিনি জানেন যে, পরার্থে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করিবার জন্যই তিনি শীল গ্রহণ করিলেন। জীবের প্রতি করুণা রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি অসীম ক্ষান্তিকে তাঁহার চিত্তের ভূষণ করিয়া লইয়াছেন। কোন দুর্ব্বিনীত নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাঁহাকে আঘাত করিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না; মনে করিবেন, আমি যখন দেহধারী জীব তখন আমাকে দৈহিক উৎপীড়ন সহিতেই হইবে। আঘাতকারী

ব্যক্তি আমার শত্রু নহে, বুদ্ধগণেরই ন্যায় পরম মিত্র ; আঘাত করিয়া সে আমাকে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে ; নিষ্পাপ হইবার নিমিত্ত আমাকে এই গুণ দুইটীর অধিকারী হইতে হইবে। যাহারা আমার সহিত শত্রুতাচরণ করে তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া আমি তাহাদিগকে কৃপা করিব। বুদ্ধগণ যেমন অবিচলিত চিত্তে মুক্তির চিন্তা করিয়াছেন আমিও তাহাই করিব।

সাধনা দ্বারা বোধিসত্ত্ব দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ প্রভৃতি অলৌকিক ঋদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল ও শান্তি লাভ করিয়াও কৃতার্থ হন। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি কোন কালেই নিবদ্ধ নহে। তিনি পরম পাপীর উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে নরকের দুর্গমতম প্রদেশে গমন করেন। তাঁহার সমস্ত তেজোবীর্য্য, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চেষ্টা জীবপ্রীতির রসপ্রস্রবণ হইতে উৎসারিত। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ-গণের ন্যায় সম্যক্ সম্বুদ্ধ নহেন। জীবহিত সাধনের উৎসাহের আধিক্যে তাঁহার কার্য্যে কত ত্রুটি, কত স্খলন, কত পতন দৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহার কোন অপরাধই স্বার্থপরতা দ্বারা কলুষিত নহে, জীবপ্রেমের দ্বারা সংস্পৃষ্ট। কিন্তু সকল স্খলন, সকল পতন সত্ত্বেও বোধিসত্ত্ব বিশ্বের উদার রাজবর্ত্ম দিয়া পরিপূর্ণ আদর্শের দিকে তীব্র গতিতে অগ্রসর হইতেছেন।

বৌদ্ধ সাধকের নির্ব্বাণ

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বৌদ্ধ সাধক যখন রাগদ্বেষশূন্য ও প্রশান্তচিত্ত হন তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হয় ? বাসনার নাশ, সংস্কারের নাশ, অবিদ্যার নাশ হইবার পরে তিনি কি অবস্থায় জীবিত থাকিবেন ? ধর্ম্মপদে উক্ত হইয়াছে ঃ—যাঁহার দেহে রাগদ্বেষাদি কিছুই নাই, যাঁহার চিত্ত শান্তিলাভ করিয়াছে, যিনি ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন সেই ভিক্ষুর অমানুষী রতি অর্থাৎ আনন্দ হয়।

আমরা সাধারণ মানুষ যাহা কিছু করিয়া থাকি আত্মসুখ কামনাই তাহার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের সর্ব্ববিধ কর্ম্মচেষ্টা এই স্বার্থপরতা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যখন শুনি যে আমাদের ক্ষুদ্র "অহং" মিথ্যা, আমাদের স্বার্থপরতা মিথ্যা, সাংসারিকতা মিথ্যা তখন আমরা একান্ত সঙ্কুচিত হই। সঙ্কোচের কারণ এই যে, আমাদের মনে এইরূপ একটি দৃঢ় প্রত্যয় বদ্ধমূল আছে যে, আমাদের স্নেহপ্রীতি, দয়া, মায়া সমস্ত আনন্দরসের উৎস অহংবোধের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যদি আমার এই অহংবোধটির বিলোপ ঘটে তবে আর রহিল কি ? কিন্তু যাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মানবপ্রকৃতির গূঢ় রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা

করিয়া থাকেন যে, মানবের ক্ষুদ্র অহংবোধের বিলোপ ঘটিলেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ তাঁহার নিকটে অবারিত হয়।

যে ব্যক্তি স্বার্থপর, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত "আমি" ও "আমার" এই লইয়াই ব্যস্ত—প্রতিবেশীকে, সর্ব্বমানবকে, বিশ্বসংসারকে সে ভালবাসিবে কেমন করিয়া ? এই অজ্ঞানতা কিংবা অবিদ্যা উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় চারিদিক হইতে তাহার দৃষ্টি রোধ করিয়া রাখে। কয়েদীর ন্যায় এই কারাগারের মধ্যে সে বাস করে, কারাবাসের অসহ্য দুঃখ সে অনুভব করে, কত সময়ে দুঃসহ দুঃখে অধীর হয়, কিন্তু তথাপি ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ কারাবেষ্টনের মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়া যায়। এই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি একমাত্র বৌদ্ধ সাধনার নহে, সর্ব্বদেশের সকলপ্রকার সাধনারই ইহা প্রধান লক্ষ্য। যাঁহারা আপন আপন জীবনের সাধনাদ্বারা বিশ্ববাসীকে এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন তাঁহারাই সর্ব্বদেশে মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হইতেছেন। তাঁহারা মহাসত্ত্ব বা মহাপুরুষ, কেননা তাঁহারা ক্ষুদ্রতার, অবিদ্যার কিংবা অহংকারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আপনাকে সর্ব্ব মানবের পরমাত্মীয় করিয়া দিয়াছেন। মহাসাধকদিগের বাণী বিভিন্ন হয় হউক, সাধনার প্রণালী বিচিত্র হয় হউক, কিন্তু তাঁহাদের সাধনার মূল এবং তাহার পরিণতি অভিন্ন। অত্যন্ত দুঃখই সকলকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এবং সিদ্ধি লাভ করিয়া সকলেই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধি লাভ করিবার পরে মহাপুরুষ

আর বদ্ধজীব নহেন, মুক্তজীব। তখন তাঁহার স্বার্থমূলক আমিত্বের বিলোপ ঘটে বলিয়া তিনি আত্মসুখ কামনায় কিছুই করেন না, যাহ কিছু করেন সমস্তই সর্ব্বহিত কামনায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাহাতে সকলের কল্যাণ, যাহাতে সকলের সুখ, প্রশান্তচিত্ত মহাপুরুষ তাহাই করিয়া থাকেন। অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি যখন দিব্যচক্ষু দ্বারা, ধর্ম্মদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত প্রত্যক্ষ করেন তখনই জীবের প্রতি প্রেমে, করুণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। এই প্রীতি, এই করুণা সাধারণ মানবের নাই বলিয়া ধম্মপদ ইহাকেই "অমানুষী রতি" বলিয়া থাকিবেন।

ধ্যানপ্রভাবে সাধকের চিত্ত যখন প্রশান্ত হয়, এবং বৈরাগ্য-বলে তাঁহার মন যখনি নির্ব্বিকার হয়—তখনই নিত্য সত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে ; অর্থাৎ জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে তখন অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ সাধক চারিটি আর্য্যসত্য প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তখন সুস্পষ্ট বুঝিয়া থাকেন, দুঃখ কি ? দুঃখ কেমন করিয়া উৎপন্ন হয় ? দুঃখের নিবৃত্তি কিরূপ ? এবং দুঃখ দূর করিবার উপায় কি ? যে ব্যক্তি নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করে চারিদিকের সংকীর্ণ সীমা তাহার দৃষ্টি রোধ করিয়া রাখে, কিন্তু যখনই সে অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে দণ্ডায়-মান হয় তখনই তাহার দৃষ্টির প্রসার বর্দ্ধিত হয়। সাধনার ক্ষেত্রে একথা সত্য। মানব যতদিন জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর লীলাভূমির মধ্যে বিচরণ করেন ততদিন অহংকারের গণ্ডী তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ

করিয়া রাখিবেই, কিন্তু যখন তিনি ধ্যানের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া নিম্নক্ষেত্রে এই সকলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন তখনই এই জরাব্যাধিমৃত্যুর সত্যরূপ তাঁহার জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে। যিনি দুঃখের মধ্যে নিমজ্জিত, দুঃখের জ্বালা তিনি অনুভব করেন সত্য, কিন্তু দুঃখের খাঁটি চেহারা তিনি দেখিতে পান না। সাধক দুঃখের ঊর্দ্ধে উন্নীত হইয়াই দুঃখের সত্যমূর্ত্তি দর্শন করেন। ইহাই তাঁহার নির্ব্বাণলাভ।

স্থূলতঃ বৌদ্ধ সাধকের নির্ব্বাণ, বাসনার নির্ব্বাণ—সংস্কারের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ। কিন্তু এই নির্ব্বাণ কেবলমাত্র বিনাশ নহে,—কারণ তিনি ভ্রান্তির হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়াছেন মাত্র; সাধনার পূর্ব্বে তিনি নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া যাহা তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর ছিল না, সাধনা দ্বারা ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাহা সত্যরূপে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এই মাত্র। বৈজ্ঞানিক তাঁহার আলোক যন্ত্র ঘুবাইয়া-ফিরাইয়া যখন একখানি পটের উপরে আলোকপাত করেন তখন তাহার উপরে নানা চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, অনন্ত আকাশে আলোকপাত করিলে প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। মানবের আমিত্বও এইরূপ একখানি সমীপবর্ত্তী স্থূল পটমাত্র, উহারই উপরে নানা দুঃখবেদনার ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি যখন স্থূল আমিত্বকে অতিক্রম করিয়া অসীমে মিশিয়া যায় তখন আর তাহার দুঃখ বোধ থাকে না। এইরূপ

ভূমিকা

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম্ এ
মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত)

মহাকবি কালিদাস তাঁহার মহাকাব্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের চরণে প্রণাম করিতে গিয়া এই চমৎকার কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, যাঁহারা শক্তিমান্ তাঁহারা বজ্রসূচীর ন্যায় শক্তিশালী। সকল মহাজীবনী রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল ও রত্নেরই ন্যায় কঠিন। সেই সব জীবনী মানুষ ব্যবহার করিত কেমন করিয়া যদি না মহাকবি তাঁহাদিগকে সর্ব্বমানবের গ্রহণযোগ্য করিতেন? হীরকের সূচী যেমন রত্নের মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহাকে সর্ব্বলোকলভ্য করিয়া দেয় তখন যে-কেহ সেই রত্নে সূত্র প্রবেশ করাইয়া কণ্ঠে ধারণ করিতে পারে, তেমনি যাঁহারা কবি ও শক্তিমান্ তাঁহারা এই জগতের রত্নবৎ ভাস্বর ও রত্নবৎ দৃঢ় মহাপুরুষ চরিত্রকে সকলের গ্রহণীয় করিয়া দেন। এমন দুঃসাধ্য কর্ম্মে কালিদাসও হাত দেন নাই, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিগণের কৃত রন্ধ্র আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাব্যমালা গাঁথিয়াছিলেন। বজ্রসূচীর কর্ম্ম নিজে করিতে সাহস পান নাই। অন্ততঃ এইরূপ একটা বিনয় গ্রন্থারম্ভে তিনি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অল্পশক্তি বলিয়াই সেইরূপ বিনয় বাদ দিয়া থাকি। আমার ন্যায় লোককেও যে এইরূপ একখানি ভক্তচরিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানিকে গ্রহণযোগ্য করিয়া দিতে হইবে তাহা কে জানিত? অনেক অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতিতেও নিষ্কৃতি মিলিল না।

অনুরোধে, অনুরোধ অপেক্ষা আরও কঠিন প্রীতির শাসনে আমায় এই ভার লইতে হইল। কালিদাসের বোধ হয় কোন বন্ধু ছিলেন না, অন্ততঃ সেই সব বন্ধুদের কেহ গ্রন্থকার ছিলেন না এবং মুদ্রাযন্ত্রও তখন ছিল না, তাহা হইলে দেখিতাম কেমন করিয়া বিনয় রক্ষা পাইত? কালিদাসের কবিত্ব শক্তি বাদ দিয়াও সেই নিষ্কণ্টক যুগটির প্রতি অত্যন্ত লোভ উপস্থিত হয়।

গ্রন্থকার আমার বন্ধু; একই কর্ম্মে আমরা পরস্পরের সহযোগী। এমন অবস্থায় তিনি আমার শক্তিহীনতা দেখিয়াও দেখিলেন না কেন?—প্রেমে।

প্রেম একটি অপূর্ব্ব বজ্রসূচী, ইহার প্রসাদেই একজন আর একজনকে, মানব সকলকে লাভ করে। এই নানা লতাপাদপ-রম্য, নানা জীবজন্তুদেবমানববিচিত্র নিখিললোক আমার নিকট একটী নির্ব্বাসন ভূমি হইত যদি প্রেম না থাকিত; তবে সকলের মধ্যে আমি একা, গৃহের মধ্যে আমি বন্দী। প্রেমেই আমরা একজন আর একজনকে পাইয়া কৃতার্থ হই। মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় সকলের মহোৎসব লাগিয়া যায়।

এমন যে মহামূল্য প্রেম, তাহাকে ত বিনামূল্যে কিনিতে পারি না। এই প্রেমটি পাওয়া মাত্র সীমাসংখ্যার বোধখানি বিসর্জ্জন দিতে হয়। পুত্রের রূপ কতটা তার সন্ধান মার কাছে মিলিবে না; সেই নয়নে ঐ রূপের সীমা নাই; পুত্রের কি গুণ তাহা পিতা বলিতে পারেন না, প্রেমে তিনি সীমাকে যে ছাড়াইয়া বসিয়াছেন।

তবে কি প্রেমের ধর্ম্মই অসত্য? একথা সত্য নহে।

আমরা মনে করি প্রত্যেক বস্তুর চারিদিকে যে ক্ষুদ্রতার সীমা আছে তাহাই বুঝি একান্ত সত্য। কিন্তু এই কথাই কি পরম সত্য? প্রত্যেক বস্তুই ও প্রত্যেক মানবই যে আবার তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল সীমা অতিক্রম করিয়া মহাগৌরবে বিরাজমান, এই লীলাই ত সাধক দেখিতে চাহেন? সাধকের সাধনাপূত নয়নে অণু আর অণু নাই—"সমত্বং গিরি সর্ষপয়োঃ"—"সর্ষপ ও পর্ব্বত তুই-ই সমান"; এইখানেই দর্শক ও পূজক একান্ত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। যে কেবলমাত্র চাহিয়া দেখিতেছে সে ত বস্তুর চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্রসীমাগুলিকেই বড় করিয়া দেখিবে; কিন্তু যে হৃদয় দিয়া দেখিতেছে ও পূজা করিতেছে সে ত এই সীমার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বসিয়াছে।

এইখানেই ঐতিহাসিকে ও ভক্তে প্রভেদ। ঐতিহাসিকের কাছে কোন বিশেষ ব্যক্তির কোন বিশেষ স্থান বা কোন বিশেষ কাল তাহার আপনার চতুর্দ্দিকের সীমার মধ্যে আবদ্ধ; কিন্তু ভক্তের নয়নে সেই সব সীমা কোথায় মিলাইয়া যায়! সকল জগৎ যেমন, ব্রজভূমিও তেমনি, কিন্তু বৈষ্ণবের নয়নে সেই ভূমির কি আর তুলনা আছে? সে যে দেখে না, সে পূজা করে। যখন মহাপ্রভু চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন তখনও দিনরাত্রি আজিকারই মত নিষ্পন্ন হইত; কিন্তু সেই পুণ্যযুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া ভক্ত বৈষ্ণব বাসুদেব ঘোষ জীবনকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—"জীবন বৃথা," নরোত্তম দাস বলিয়াছেন—"নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া।"

বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় যে সব মহাপুরুষ জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা যে কেবলমাত্র এই জগৎকে পবিত্র করিয়া যান তাহা নহে, তাঁহারা আমাদের একটী সুগভীর উপকার করিয়া দিয়া যান। আমাদের অন্তর আত্মাকে প্রাণ দিয়া যান, আমাদের আত্মাকে খাদ্য দিয়া যান। এই পৃথিবীর মাটিতে যে রস আছে, আকাশে যে সার আছে তাহাতো আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। বৃক্ষগণ নিঃশব্দে বসিয়া বসিয়া তাহা গ্রহণ করে এবং আমরা বৃক্ষমণ্ডলীর উপার্জ্জিত ফল, মূল, পত্র, কাণ্ড গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করি। আকাশে এবং মাটিতে যে সার পদার্থ আছে তাহা নিৰ্জ্জীব (Inorganic), তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া সজীব (Organic) করে কে ?—ঐ পাদপ-মণ্ডলী। জীব ও জড়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা ক্রমাগত জড়লোক হইতে সকল সার লইয়া জীব মাত্রের গ্রহণীয় করিয়া দিতেছে। বৈষ্ণবেরা ভক্তকে বৃক্ষের ন্যায় বলিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক রহস্যটুকু তবু তাঁহারা জানিতেন না।

জগতে এমন কত কত জ্ঞানগম্য সত্য আছে যাহাতে জীবন-সঞ্চার করা হয় নাই। তাহা আমরা জ্ঞানে জানি, কিন্তু অন্তরে গ্রহণ করিতে পারি না। এই সব মহাপুরুষ সেই সব নিৰ্জ্জীব সত্যকে সাধন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়া দেন, তখন সকলেই সেই সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে। তৃণভোজনে অসমর্থ প্রাণীর জন্য গাভী তৃণ ভোজন করিয়া উধোভাণ্ডে দুগ্ধ সঞ্চার করে ; অন্নগ্রহণে অসমর্থ শিশুর জন্য মাতা স্তনে অমৃত

রস ভরিয়া তোলেন। তখন জীবকুল পরিতৃপ্ত হয় ও শিশুকুল বাঁচিয়া যায়।

পরমেশ্বর সর্ব্বলোক চরাচরের পিতা, জ্ঞানে এই কথা কে না জানে? কিন্তু মহাপুরুষ খৃষ্ট আসিয়া পুত্রত্বকে সাধন করিলেন আর অমনি জগদ্‌বাসী কত লোক ভগবানকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গেল। ভগবান্ ত্রিলোকের পতি সকলেই জানে, মহাপ্রভু চৈতন্য সেই প্রেমসম্বন্ধ সাধন করিয়া গেলেন। বৈষ্ণব-গণ সেই রস হাতের কাছে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

তাই বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা নির্জ্জীব সত্যগুলিকে ধরিয়া সাধনাদ্বারা জীবন্ত করিয়া দেন, তখন সত্য আমাদের জিজ্ঞাস্য মাত্র থাকে না, তাহা আমাদের অন্তরের খাদ্য এবং প্রাণের আশ্রয় হইয়া উঠে।

এই পন্থায় বিপদ্‌ও আছে। জগতে কোন্ মহামূল্য নিধি বিনামূল্যে মানুষ লাভ করিয়াছে? ইহারও মূল্য দিতে হয়, বড় বিষম মূল্য দিতে হয়। যত দিন জ্ঞান নির্জ্জীব থাকে তত দিন তাহা পচে না, কিন্তু যেই তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে, তখনি তাহা বস্তুর ন্যায় প্রাণহীন হইলেই পচিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মের এইরূপ বিকারে জগতে যত রক্তারক্তি ও মহাঅনর্থপাত ঘটিয়াছে তত কি নীচতম স্বার্থসাধন করিতে গিয়াও ঘটিয়াছে? কত হত্যা, কত দাহ, কত অত্যাচার, কত নিষ্ঠুরতা, কত কুসংস্কার, কত নির্য্যাতন! বড় কঠিন মূল্যে জীবন্ত সত্যকে গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু উপায় নাই, এই ভাবেই জীবন্ত সত্যগুলিকে মানব এ যাবৎ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই বিপদ্ বাদ দিয়া সাধনাকে গ্রহণ করিবার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। যাঁহারা অতিশয় সাবধান হইতে গিয়াছেন তাঁহাদের সুচতুর নানা বন্ধনেই সত্যের প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে। সত্য জীবন্ত হইবে অথচ বিপদ্ থাকিবে না এমন উপায় আছে কোথায়? তাহার একমাত্র উপায় আছে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সর্ব্বাপেক্ষা উদার কিন্তু সেই জন্যই অতিশয় কঠিন। সেই উপায় সদা প্রাণবান থাকা। আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, মতে, সাধনায়, সেবায় কোথাও প্রাণহীন হইও না, তবে এই গলিত বিকারের প্রলয় হইতে রক্ষা পাইবে।

যাক্ সে কথা। মহাপুরুষেরা সত্যকে এই জীবন দেন বলিয়া সাধকমণ্ডলী যে তাঁহাদের কাছে যে কি উপকৃত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐতিহাসিক সেই সব মহাপুরুষকেও অন্যান্য মানুষের মত দেখেন কি না, তাই স্থান, কাল, ঘটনা ও নানাবিধ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়াই তাঁহাদিগকে দেখেন; কিন্তু সাধক মহাপুরুষকে বাহিরের ইন্দ্রিয়লোকে রাখেন না, তাঁহাকে একেবারে অন্তরলোকে লইয়া গিয়া "মনের মানুষ" করেন, তখন আর ত সীমার বা পরিমাণের বোধ থাকে না, তাই ভক্তদের হৃদয়ে মহাপুরুষগণ চিরদিনই সীমা অতিক্রম করিয়াই বিদ্যমান। খৃষ্ট ঐতিহাসিকের কাছে একজন মানুষ, পুণ্যবান্ সচ্চরিত্র হইলেও একজন মানুষ মাত্র, কিন্তু খৃষ্টীয়

সাধকের কাছে তিনি প্রেমলোকবিহারী মনের মানুষ অতএব আর তাঁহাকে স্থান-কাল-ঘটনার সীমার মধ্যে রক্ষা করা চলিল না।

কত মানব জগতে আছে কিন্তু আমার গৃহে যখন একটি মানবশিশু জন্মলাভ করে তখন ধূপ ধূনা-শঙ্খ ঘণ্টারবের মঙ্গলাচারে তাহাকে গৃহে গ্রহণ করি। জীর্ণচীর দরিদ্র যে দিন বিবাহে চলে সেদিন তার রাজসজ্জা, রাজাও তাহার জন্য পথ ছাড়িয়া দেন, আজ যে সে প্রেমলোকে প্রবেশ করিবে, আজ সে রাজারও বড়। মহাপুরুষ আমার অন্তরের প্রেমলোকে আসিবেন কি প্রতিদিনেরই জীর্ণ চীর পরিয়া? কণ্টকক্ষতচরণে, রৌদ্রদগ্ধবদনে, ক্ষুৎক্ষামদেহে? না, তিনি আসিবেন রাজার ন্যায় সমারোহে জয়বাদ্য বাজাইয়া, সর্বৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া।

যে মুহূর্ত্তে সাধকের অন্তরমধ্যে মহাপুরুষগণ প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহারা ঐতিহাসিক জন-সুলভ সব সীমাকে অতিক্রম করেন। তখন কোথাও সীমা নাই, শেষ নাই এবং কোনরূপ পরিমাণ নাই। সবই অনন্ত, সবই অসীম, সবই অশেষ। প্রেমের পরশমণির সিংহাসনের একেবারে উপরে যে তিনি আজ বসিয়াছেন। এই জন্যই বুদ্ধের দুই রূপ আছে, এক রূপ ঐতিহাসিকের নেত্রে, সেখানে তিনি রাজার পুত্র, কপিলবাস্তুতে তাঁহার জন্ম, নিরঞ্জনার তীরে তিনি সাধনা করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু আর এক রূপ আছে ভক্তের অন্তরে, সেখানে ভক্তের হৃদয়কমলে তাঁহার জন্ম, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য তাঁহার ভূষণ, সকল বিচিত্র ব্যাপারই তাঁহার লীলা ইত্যাদি।

এই পন্থার বিপদ্ বিস্তর। একটু প্রাণহীন হইলেই পচিয়া উঠিবার আর শেষ নাই। কিন্তু সাধনা অন্তরের বস্তু প্রেমের ধন। মহাপুরুষকে অন্তরলোকে না নিয়া সাধক যে পারেন না; উপায় যে নাই।

তাই ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদের কাছে আর একরূপ, সেখানে তাঁহারা তাঁহাকে পূজা করেন, একেবারে বুদ্ধেরই তপস্যা করেন। এই দুই রূপে সামঞ্জস্য কোথায়? সামঞ্জস্য করা কি কঠিন, সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, ভক্তের প্রেমবারি সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়া। সামঞ্জস্য হইলে যে বাঁচা যাইত।

এই গ্রন্থে সেই সামঞ্জস্যের জন্য গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে রক্ষা করিতে হইবে অথচ ভক্ত মহাপুরুষের জীবনীকে প্রাণহীন করাও হইবে না, বড় কঠিন ব্রত। মহাদেবের কুণ্ঠিত নৃত্যের চিত্র মনে পড়ে। আনন্দ তাঁহার অসীম অথচ সীমার জগতে তাঁহার নৃত্যলীলা করিতে হইবে। তাই সকল দিগ্গুলের সীমায় সীমায় তাঁহার নৃত্যলীলা কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে। এই দুরূহ ব্রতে গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে পরিমাণ সাফল্য আশাও করি নাই তাহাও লাভ করিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই দুই বিরুদ্ধ ধারাকে মিলিত করিয়া দীর্ঘ সময় চলা অসম্ভব, এই পথখানি যে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।" এইরূপ গ্রন্থ দীর্ঘ হইতেই পারে না, তাই এই গ্রন্থখানি খুব

গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব। অ-বৌদ্ধ সাধকের কাছে এইরূপ একখানি গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন ছিল; এই গ্রন্থে বুদ্ধের ঐতিহাসিক শুষ্ক মূর্ত্তিও নাই, আবার তিনি একেবারে দেবতা হইয়া অতি-প্রাকৃত হইয়া উঠেন নাই। এখানে তাঁহার সাধকবেশ। যে বেশে তিনি নিজে সাধনা করিয়াছেন সেই বেশেই সকল দেশের, সকল যুগের ও সকল সম্প্রদায়ের সাধকের হৃদয়ে অসাধারণ সেবা-রস ও অপূর্ব্ব সাধন-রস সঞ্চার করিতেছেন। তাই এই গ্রন্থে তিনি অতি প্রাকৃত নহেন। এই হরিহরের মিলনে যজ্ঞটি বড় মধুর হইয়াছে।

গ্রন্থকার গ্রন্থের সমস্ত বস্তুই বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে বা ভক্তদের লেখা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। শাস্ত্রে অবশ্য বুদ্ধবাণী ও বুদ্ধকাহিনী আছে কিন্তু ঐতিহাসিক বুদ্ধের ন্যায় শাস্ত্রের বুদ্ধবাণীও শুষ্ক। মহাপুরুষদের বহু বাক্য শাস্ত্র ঠিক বুঝিতে পারে না—তাহা তাঁহাদের সাধকেরাই বোঝেন, কারণ তাঁহারা তো জ্ঞান বা দর্শন বলিতে আসেন নাই যে শাস্ত্রে বা দর্শনে তাঁহাদের সব কথা ধরা পড়িবে। তাঁহাদের সাধনার গভীর বাণী বহু সময় শাস্ত্রে ধরা পড়েই না, এমন কি অনেক সময় তাঁহারা নিজেরাও তার সবটা ভাবিয়া দেখেন না। সাধক সাধনা করিয়া সেই সব তাৎপর্য্য বাহির করিয়া লয়েন।

মহাসাধকদের বাণী-ই মন্ত্র। মন্ত্র মাত্রেই বীজমন্ত্র। বীজের মধ্যে যে রূপটি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা কি শস্যের দোকানের পাষাণ-

ভিত্তিতে স্তূপীকৃত বীজের মধ্যে প্রকাশ পায়? ভক্তের সরস চিত্তউদ্যানে তাহার অন্তর-নিহিত শ্যামলতা, নানা পুষ্পবর্ণ-বিচিত্রতা, নানা ফলনিহিত মাধুর্য্য ধরা পড়িয়া যায়। তার স্পন্দন, কম্পন, ছায়া, রূপরসগন্ধ দেহমনপ্রাণকে জুড়াইয়া দেয়।

বুদ্ধ সাধক ছিলেন না, একথা যিনি বলেন তাঁহাকে বলিবাব মত আমার কিছু নাই। যে মহাসাধক তিনি ছিলেন—তাঁহার বাণী কি মন্ত্র না হইয়া যায়? তাহা না হইলে কি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানব তাঁহার বাণীতে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া যায়? শাস্ত্র দেখিয়া কি সেই বাণীর সব সার্থকতা বুঝা যায়? তাই গ্রন্থকার যত পারেন শাস্ত্র হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু মাঝে মাঝে সেই রত্নাবলীর তাৎপর্য্যের জন্য বুদ্ধের সব সাধকদের দুয়ারে হাত পাতিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে এমন একটি পংক্তি নাই যাহা হয় বৌদ্ধশাস্ত্র, না হয় কোন ভক্তজনের গ্রন্থ হইতে না লইয়াছেন। শাস্ত্রের এবং ভক্তের কাছে বাণী ও উপদেশ ভিক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক যাথাতথ্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া সাধক বুদ্ধের চরণে মন নত করিয়া যে অমৃত তিনি আজ আমাদিগকে পরিবেষণ করিয়াছেন তার জন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি না।

এমন গ্রন্থের আরম্ভে প্রগল্‌ভতা সাজে না। ইতিপূর্ব্বেই যতখানি অপরাধ করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমি এখানেই নিবৃত্ত হইব।